যাত্নকর মার্কনী, বিজয় অভিযান, দ্বাদশ সূর্য্য, উদাসী বাবার
আখড়া ও সমুদ্রজয়ী কলম্বাস প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

মূল্য এক টাকা

প্রকাশক—শ্রীসুবোধকুমার মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা
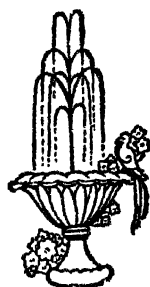
শ্রাবণ—১৩৫২

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস লিঃ
২৫, ডি. এল্. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উপহার

পাশ দিয়া সোঁ করিয়া বর্শা চলিয়া গেল

[পৃঃ—২১

আব্রাহাম্ লিন্‌কন্

পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি।

মহাসমুদ্রের বুকে একটী ছোট্ট পায়রার মত একখানি জাহাজ।

তাহার মধ্যে নাবিকেরা সকলে পাগল হইয়া উঠিয়াছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, তাহারা সমুদ্রের বুকের উপর দিয়া চলিয়াছে। তাহাদের নেতা, তাহাদের আশ্বাস দিয়াছিল, মহাসাগরের ওপারে নাকি এক নূতন দেশ আছে। তাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল। কিন্তু আজ আর সে বিশ্বাস নাই। অসম্ভব...অসম্ভব...এই সাগরে সীমাহীন জলরাশির পারে মাটি নাই, থাকিতে পারে না। তাই অসম্ভবের পিছনে ছুটিয়া অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর মুখে গিয়া পড়িতে তাহারা চাহে না। তাহারা ফিরিয়া যাইবে।

কিন্তু তাহাদের নেতা, তিনি ফিরিবেন না, কাহাকেও ফিরিতে দেবেন না। তাঁহার বিশ্বাস তেমনি অটুট আছে, এই মহাসাগরের পারে নিশ্চয়ই পৃথিবীর মাটি আছে। নেতার নাম কলম্বাস্।

নাবিকরা বিদ্রোহ করিল…কলম্বাসকে হত্যা করিবে ভয় দেখাইল…

কিন্তু কলম্বাস ফিরিলেন না…

তাঁহার বিশ্বাসই জয়যুক্ত হইল…তাঁহার জাহাজ তীরে আসিয়া লাগিল…

আটলাণ্টিক মহাসাগরের ওপারে য়ুরোপ ও আমেরিকার দেখা-শোনা হইল।

নূতন দেশ…নূতন পৃথিবী।—

[২]

য়ুরোপ হইতে কলম্বাসের পথ ধরিয়া দলে-দলে শাদা-চামড়াওয়ালা লোকেরা সেই নূতন দেশে আসিতে লাগিল; বন কাটিয়া, জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বসবাস করিতে লাগিল।

শাদা-চামড়াওয়ালা নূতন লোকদের দেখিয়া, সেখানকার আদিম লোকেরা শঙ্কিত হইয়া উঠিল। যুগ-যুগান্ত ধরিয়া অরণ্যের পশুদের সঙ্গে অরণ্যে-অরণ্যে তাহারা নির্ব্বিবাদে তাহাদের আরণ্যক জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছে। এ আবার কাহারা আসিল?

যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা দেশের ভিতরে যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই তাহারা সভয়ে দেখিল,—শুধু অরণ্যের পশু

নয়, তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী এক রকম আরণ্যক মানুষও রহিয়াছে ...যাহাদের হাতের বর্শা কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।

যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা সেখানকার আদিম অধিবাসীদের নাম রাখিল, রেড্-ইণ্ডিয়ান্।

কারণ, কলম্বাসের ধারণা ছিল যে, তিনি আটলাণ্টিক মহাসাগরের ওপারে ইণ্ডিয়াই আবিষ্কার করিয়াছেন।

ক্রমশ য়ুরোপের আমদানী শাদা-চামড়াওয়ালা লোকদের সঙ্গে রেড্-ইণ্ডিয়ান্‌দের সংঘর্ষ বাধিয়া গেল। শাদাচামড়া-ওয়ালাদের হাতে বন্দুক, রেড্-ইণ্ডিয়ান্‌দের হাতে বিষমাখা বর্শা।

বন্দুক আসিয়া বর্শাকে হঠাইয়া দিল। মৃত, আহত, এবং পরাজিত হইয়া রেড্-ইণ্ডিয়ান্‌রা ক্রমশ তীরভূমি ছাড়িয়া গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিল।

তীরভূমিতে শাদা-চামড়াওয়ালা য়ুরোপের লোকেরা ঘর-বাড়ী তুলিয়া বসবাস করিতে লাগিল। নূতন মাটি, নূতন মানুষ ...মনে তাহাদের নূতন উদ্যম। কিন্তু তখনো তাহারা সব বিচ্ছিন্ন। যে যাহার স্বার্থ ও সুখ লইয়া স্বতন্ত্র ভাবে বাস করে।

এই শাদা-চামড়াওয়ালাদের মধ্যে একদিন ইংলণ্ড হইতে একদল লোক "মে-ফ্লাওয়ার" নামে এক জাহাজে অবতরণ করিলেন।

ইংলণ্ডে তখন রাজা ছিলেন প্রথম চার্লস্। তাঁহার

শাসনে, এই লোকগুলি উত্যক্ত হইয়া নিজেদের জন্মভূমির সম্পর্ক চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়া, ইহারা এই নূতন পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মানুষের দেহ ও মনের স্বাধীনতা যেখানে অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে, অরণ্য হইলেও সে স্থান স্বর্গ। তাই সেই কয়েকজন স্বাধীনতার পূজারী সেদিন জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া আমেরিকার অপরিচিত মাটিতে নূতন বাসভূমি গড়িয়া তুলিলেন।

ইংলণ্ড হইতে তাঁহারা আসিলেন, নিউ ইংলণ্ডে অর্থাৎ আমেরিকায়···শহর হইতে অরণ্যে···সভ্যদের সুনির্দ্দিষ্ট জীবন হইতে স্বাধীনতার মুক্ত আলোকে···অন্তরে অনন্ত পিপাসা··· নূতন মানুষ গড়িয়া উঠিবে, নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিবে···যে সমাজে মানুষ মানুষকে কখনো শ্রদ্ধা করিতে ভুলিবে না···

সেই কয়েকজন লোকের মধ্যে স্যামুয়েল লিন্‌কন্ নামে একজন ইংরাজ ছিলেন। সেই অরণ্য-সঙ্কুল দেশে, অন্য সহযাত্রীদের মত তিনিও স্থির করিলেন, সেইখানেই নূতন করিয়া জীবন গড়িয়া তুলিবেন···

ক্রমশ তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে লাগিলেন···তাঁহারা ইংলণ্ড ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইংলণ্ড তাঁহাদের ছাড়ে নাই। কারণ, আমেরিকা তখন ইংলণ্ডের রাজার শাসনের অধীন। ইংলণ্ডের রাজা আমেরিকার ইংরাজদের নিকট হইতে কর

আদায় করিতে লাগিলেন। ক্রমশ করের মাত্রা তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে লাগিল। ইংলণ্ড য়ুরোপে তখন যুদ্ধ করিতেছিল, যুদ্ধের জন্য টাকার প্রয়োজন। সেই টাকা আমেরিকার ইংরাজ প্রজাদের নিকট হইতে কর-স্বরূপে আদায় হইতে লাগিল। ইংলণ্ডের সৈন্যরা রহিল কর আদায়ের জন্য।

ক্রমশ আমেরিকায় ইংরাজ প্রজারা নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে লাগিল...তাহারা বুঝিল, যে করের কোন সুযোগ তাহারা পাইতেছে না, সে কর তাহারা দিবে কেন? তাহারা একে-একে কর দেওয়া বন্ধ করিতে লাগিল। ইংলণ্ডের সৈন্যরা বন্দুকের মুখে তাহা আদায় করিতে আসিল। মাতৃভূমির অত্যাচারে ইংরাজ সেদিন জন্মভূমির বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইল।

তাহারা স্বাধীন মানুষ...বন কাটিয়া, জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, মৃত্যুকে মুখোমুখি রাখিয়া নূতন দেশ, নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিতেছে...তাহার মধ্যে আটলাণ্টিক মহাসাগরের ওপার হইতে ইংলণ্ড কেন বন্দুক-ভরা হাত বাড়াইবে?

তাহাদের মধ্যে জর্জ্জ ওয়াশিংটন নামে এক বীর সৈনিক ছিলেন। তিনি আমেরিকার নূতন মানুষের দলকে স্বাধীনতার নামে সঙ্ঘবদ্ধ করিলেন...এবং ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই ঘোষণা করিলেন যে, স্বাধীনতার নামে আজ তাঁহারা মিলিত হইয়া এই নূতন দেশকে তাঁহাদের সৃজিত নূতন আইন অনুসারে

শাসন করিবেন…তাঁহাদের এই নূতন রাষ্ট্রের মূল কথা হইবে, নিজেরা স্বাধীন থাকিব, জগতের সকলের স্বাধীনতাকে স্বীকার করিব, শ্রদ্ধা করিব।

জর্জ্জ ওয়াশিংটনের নূতন মানুষের দল জয়ী হইল… আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইল…জর্জ্জ ওয়াশিংটন হইলেন তাহার প্রথম সভাপতি…রাজা কেহ নাই…কেহ থাকিবে না…আপনার কৃতিত্বে, জাতির অনুমোদনে যে যোগ্য বিবেচিত হইবে, সে-ই হইবে এই স্বাধীন রাষ্ট্রের নায়ক… য়ুরোপ বহুদিন দেখিয়াছে রাজা-মহারাজার শাসন…এবার আসুক মানুষ-রাজার শাসন…মানুষে-মানুষে দূর হইয়া যাক্ জন্মসূত্রে-পাওয়া উঁচু-নীচুর ভেদ-বুদ্ধি!

সেদিন আটলাণ্টিক মহাসাগরের তীরে সুরু হইল, এক মহা-পরীক্ষা। একদিনেই এই মহা-পরীক্ষা সফল হইয়া ওঠে নাই। অনেক মহাপ্রাণ এই যজ্ঞে আত্মবলি দিয়াছেন…তবে স্বাধীনতার, মানুষের আত্মিক মর্য্যাদার এই মহাযজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়াছে…

আব্রাহাম লিন্‌কন্ মানব-সভ্যতার এই মহা-পরীক্ষার যজ্ঞে আত্মবলি দেন…তাই শুধু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নয়… সমগ্র সভ্য জগতে মানুষ মহাসম্ভ্রমে এই মহাত্মার নাম আজিও উচ্চারণ করিয়া থাকে…যেদিন পৃথিবীতে মানুষের স্বার্থ ও

জঘন্য লোভের সংগ্রাম শেষ হইয়া নবীনতর পৃথিবী গড়িয়া উঠিবে…সেদিন সেই মহা-মানুষের মিলন-মেলায় যাঁদের প্রতিমূর্ত্তির তলায় মানুষ মিলিত হইয়া নিজেদের ধন্য মনে করিবে, আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ হইলেন তাঁহাদেরই একজন।

[৩]

আজকাল যেখানে ম্যাসাচুসেট্‌স্ শহর গড়িয়া উঠিয়াছে, স্যামুয়েল লিন্‌কন্ তাহারই কাছাকাছি কোন জায়গায় বসবাস স্থাপন করেন। স্যামুয়েলের নাতি আব্রাহাম্ লিন্‌কন্; আব্রাহাম্ লিন্‌কনের নাতি হইলেন, যাঁহার জীবনের গল্প আমরা আলোচনা করিতেছি। তিনি তাঁহার পিতামহের নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

স্যামুয়েলের নাতি আব্রাহাম্ লিন্‌কনের অবস্থা খুব খারাপ হইয়া যায়। তিনি পৈতৃক ভিটা ত্যাগ করিয়া ক্যান্‌টাকীর জঙ্গলে আসিয়া, বন পরিষ্কার করিয়া, কোন রকমে গাছ কাটিয়া একটী কাঠের ঘর তৈয়ারী করিলেন। তাঁহার তিন ছেলে, মর্দ্দেসাই, জোসিয়া এবং টমাস।

মর্দ্দেসাই এবং জোসিয়া অতি অল্প বয়সেই পিতার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যে যাঁহার ভাগ্যের অন্বেষণে বাহির হন। ভাগ্য তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা আর দরিদ্র পিতার কোন খবর লওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

ছোট ছেলে টমাসকে লইয়া আব্রাহাম্ ক্যান্‌টাকীর সেই জন-মানবহীন জঙ্গলে কোন রকমে আপনার দরিদ্র-জীবন যাপন করিয়া চলিয়া যান। টমাস সেই জঙ্গলে বাস করিতে-করিতে ছুতোরের কাজ শিখেন এবং তাহাতেই কোন রকমে দুঃখে-কষ্টে তাঁহার সংসার চলিয়া যাইত। তাঁহার সংসারের মধ্যে ছিল, তাঁহার স্ত্রী ন্যান্‌সী, এবং তাঁহার দুইটী সন্তান। প্রথম সন্তানটী হইল কন্যা, নাম সারা,—দ্বিতীয় সন্তান হইল পুত্র, আব্রাহাম্ লিন্‌কন্…যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি…জগতের স্বাধীনতা-পূজারী কর্ম্মবীরদের অন্যতম।

যুক্তরাষ্ট্রের সেই শৈশবকালে, তখন এখনকার মত মেঘচুম্বী বাড়ী, কলকারখানা, পথ-ঘাট, বিজ্ঞানের বিবিধ বিস্ময়, যাহার জন্য যুক্তরাষ্ট্র আজ বিশ্ববিখ্যাত, তাহার কিছুই ছিল না। কোন-কোন অঞ্চলে লোকজনের বসবাসও তেমন ছিল না।

ক্যান্‌টাকীর যে-জঙ্গলে আব্রাহাম্ জন্মগ্রহণ করেন, তখনো সেখানে কোন শহর গড়িয়া ওঠে নাই, মাঝে-মাঝে বন-পরিষ্কার করিয়া দু-একঘর দুঃসাহসী লোক বসবাস স্থাপন করিতেছে। সেইখানে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী আব্রাহাম্ জন্মগ্রহণ করেন—সামান্য কাঠের ঘরে…সভ্যতা, সমাজ, রাজনীতি ও ঐশ্বর্য্য হইতে বহু—বহু দূরে।

ক্যান্‌টাকীর সেই কাঠের ঘর আর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের

সভাপতির প্রাসাদ—তার মাঝখানে ছিল দুস্তর ব্যবধান···সেদিন কেহই কল্পনা করিতে পারে নাই যে সেই দরিদ্র ছুতোরের ছেলে একদিন সেই ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়া মানব-ইতিহাসে মানুষের কর্ম্ম-প্রতিভার উজ্জ্বলতম নিদর্শন রাখিয়া যাইবে।

টমাস নিজে লেখাপড়া শেখেন নাই, লেখাপড়া সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ বা আগ্রহও ছিল না। তার ওপর, আর্থিক অবস্থাও এমন নয় যে খাওয়া-পরা বাদে অন্য কিছু ভাবা যায়। তবে সৌভাগ্যবশত তিনি পত্নীরূপে যাঁহাকে পাইয়াছিলেন, তিনি কিঞ্চিৎ লেখাপড়া জানিতেন এবং লেখা-পড়া যতটুকু জানিতেন, তাহার চেয়ে লেখাপড়ার প্রতি আন্তরিক উৎসাহ তাঁহার ঢের বেশী ছিল। তিনি স্বামীর ঘরে আসিয়া দেখিলেন যে, তিনি লিখিতে-পড়িতে আদৌ জানেন না, প্রয়োজন হইলে কোন রকমে টিপসই দিয়া কাজ সারেন। ইতিহাসে জানা যায় যে, আব্রাহামের মাতা তাঁহার পিতাকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন; কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি তাঁহার পিতার এমন একটা আন্তরিক বিতৃষ্ণা ছিল যে, আব্রাহামের মাতা শেষকালে হতাশ হইয়া সে কাজ ছাড়িয়া দেন—তবে বহু সাধ্য-সাধনার ফলে তিনি কোন রকমে তাঁহার নামটী সই করিতে পারিতেন মাত্র! সুতরাং সেই আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে এহেন পিতার নিকট হইতে লেখাপড়া

শিখিবার কোন তাগিদ আব্রাহাম্ পান নাই। তাঁহার শৈশবের একমাত্র আলো ছিল, তাঁহার মা। বড় হইয়া মাকে স্মরণ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—"I owe everything that I am to my mother—আমি যাহা কিছু হইয়াছি, তাহার জন্য আমার মা'র নিকট আমি ঋণী।"

আব্রাহাম্ যখন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি হইয়াছেন, তখন উৎসুক ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে তাঁহার বাল্যজীবনের কথা জিজ্ঞাসা করেন। তাহার উত্তরে তিনি শুধু ইংরাজ কবি গ্রে'র 'এলিজী' হইতে একটা লাইন বলিয়াছিলেন,

"The short and simple annals of the poor"—অর্থাৎ দরিদ্রের সংক্ষিপ্ত ও বৈচিত্র্যহীন সামান্য কাহিনী।

সেই সামান্য কাহিনী অনুসন্ধান করিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, শৈশবকালে বনে-বনে বুনো গ্রাম্য বালকদের মতই তাঁহার দিন কাটিত। গাছে চড়িয়া, নদীতে সাঁতার কাটিয়া, মাছ ধরিয়া, পাখী মারিয়া শৈশবের আনন্দে ক্যান্‌টাকীর জঙ্গলে-জঙ্গলে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন। একবার গাছের ডাল ধরিয়া বানরদের অনুকরণে ঝুলিতে গিয়া, ডাল ভাঙ্গিয়া নীচে নদীর জলে তিনি পড়িয়া যান, ভাগ্যক্রমে সাঁতার জানিতেন বলিয়া সেযাত্রা কোন রকমে প্রাণে রক্ষা পান।

স্বামী লেখাপড়া জানেন না, পুত্রও মূর্খ হইয়া থাকিবে,

দরিদ্র জননীকে এই চিন্তা পাইয়া বসে। সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের যে সব অঞ্চলে লোকজনের বসবাস তেমন জাঁকিয়া ওঠে নাই, সে সব অঞ্চলে ছেলেদের লেখাপড়া শিখাইবার কোন পাকা বন্দোবস্ত ছিল না। মাঝে-মাঝে দু'একজন ভবঘুরে শিক্ষক কোথা হইতে আসিয়া জুটিত। এই সব শিক্ষকদের নিজেদের বিদ্যার পুঁজিও অতি অল্প থাকিত। তাহাই ভাঙাইয়া তাঁহারা এক অঞ্চল হইতে আর-এক অঞ্চলে বেদেদের মত টোল ফেলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ক্যান্‌টাকীতে এই ধরণের একজন ভবঘুরে শিক্ষকের আগমন-সংবাদ পাইয়া আব্রাহামের মা আর কাল-বিলম্ব না করিয়া সারা এবং আব্রাহাম্‌কে তাঁহার নিকট লইয়া গেলেন। সেই নামহীন ভবঘুরে শিক্ষকের নিকট আব্রাহাম্ জীবনের প্রথম-পাঠ গ্রহণ করেন! কিন্তু সে-শিক্ষক বেশীদিন টিকিলেন না। তাঁহার কাছে আব্রাহাম্ শুধু হাতের লেখা মক্‌সো করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

এই সময় আব্রাহামের পিতা ক্যান্‌টাকী পরিত্যাগ করিয়া ইণ্ডিয়ানা প্রদেশে উঠিয়া আসিলেন। সেখানে আসিয়া আব্রাহাম্ আবার মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে ছাড়া পাইলেন। সেখানে কোন ভাল স্কুলের সন্ধান মিলিল না, আব্রাহাম্ পিতার ব্যবসায়ে পিতাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। তিনি সারাদিন কুঠার হাতে বনে-বনে ঘুরিয়া বেড়ান...ডাল ভাঙ্গেন, কাঠ কাটেন...

ঘাড়ে করিয়া সেই বোঝা লইয়া আসেন। রোদ···ঝড়···বৃষ্টি স্বাভাবিক ভাবে দেহের সমস্ত অস্থিকে পাথরের মত শক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিল···

ছেলেবেলায় তিনি মানুষের নিকট হইতে লেখাপড়ার শিক্ষা পান নাই; কিন্তু প্রকৃতি তাঁহাকে তাহার নিজস্ব পাঠশালায় এমন ভাবে গড়িয়া তোলেন যে, তাঁহার সে অভাব প্রকৃতি পরিপূরণ করিয়া দেয়। যে কর্ম্মের ফলে অসুরদের দেহও ভাঙ্গিয়া পড়ে, সেই কর্ম্মের মধ্যে তাঁহার দেহ কখনও তাঁহাকে বেদনা দেয় নাই।

পরবর্ত্তী জীবনে একবার যুদ্ধের সময় তিনি আহত সৈন্যদের হাসপাতাল পরিদর্শন করিতে যান। সেখানে প্রায় ছয় হাজার সৈনিক আহত অবস্থায় ছিল। তাহারা প্রত্যেকে লিন্‌কন্‌কে তাহাদের দেবতা বলিয়া জানিত। একজনের সহিত করমর্দ্দন করিতে হইলে, প্রত্যেকের সহিত করিতে হয়; নহিলে যাহার সহিত করমর্দ্দন না করিবেন, সে-ই অন্তরে বেদনা পাইবে। তাঁহার সঙ্গীরা সেইজন্য তাঁহাকে কাহারও সহিত করমর্দ্দন না করার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। হাসিয়া লিন্‌কন্ বলিলেন, এতগুলি লোক জানিবে যে তাহাদের নেতা প্রাথমিক ভদ্রতাও জানে না—তাহা হয় না। তিনি একে-একে সেই ছয় হাজার আহত সৈনিকদের সহিত করমর্দ্দন করিলেন।

তাঁহারা কাঠের যে বাড়ীখানিতে থাকিতেন, তাহার ছিল একটী মাত্র ঘর। সেই ঘরের ভিতর মাচায় ভাই-বোন দুজনে থাকিত। শীতকালে কাঠের ফাঁক দিয়া হু-হু করিয়া দুরন্ত শীতের হাওয়া তাহাদের হাড় পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিত। বর্ষার দিনে ঝর্ণার মত সেই ঘরের চাল দিয়া নীচে জল ঝরিয়া পড়িত। সন্ধ্যাবেলায় যখন চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিত, সারা বন থম্‌থম্ করিত ভয়ে,—রেড্-ইণ্ডিয়ান্‌দের ভয়ে। যে-কোন মুহূর্ত্তে অন্ধকারে গাছের আড়াল হইতে বিষাক্ত বর্শা হাতে তাহারা ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে, যে-কোন মুহূর্ত্তে সেই কাঠের ঘর রক্তে রাঙা হইয়া উঠিতে পারে! তাই সেই অরণ্য-জীবনের মধ্যে তাহাদের সব চেয়ে বড় সম্বল ছিল, বন্দুক—এবং পায়ে ভর দিয়া হাঁটিতে শিখিবার সঙ্গে-সঙ্গে লিন্‌কন্‌কে বন্দুক ধরিতে শিখিতে হয়। দুই পাশে পুত্র ও কন্যাকে লইয়া মা গল্প বলিতেন,—বাইবেলের গল্প, রেড্-ইণ্ডিয়ান্‌দের গল্প, তাহাদের আগে আমেরিকায় যাহারা আসিয়াছিল তাহাদের গল্প। বালকের অন্তরে যে তীব্র জ্ঞানের পিপাসা ছিল, মা'র মুখে সেই সব গল্প শুনিয়া বালক সেই তৃষ্ণা দূর করিত।

খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে বাছিয়া খাইবার কিছুই ছিল না। এক রকম বুনো গম হইত, তাহা পিষিয়া আটা হইত। সেই আটা হইতে যে রুটি হইত, তাহাই ছিল তাঁহাদের

একমাত্র খাদ্য। শিকার করিয়া যদি কোন পশু বা পাখী জুটিত, রুটির সঙ্গে তাহার মাংস মিলিত। নতুবা সেই শুকনো বুনো আটার রুটিই খাইতে হইত এই ভাবে প্রায় যৌবনের প্রথম দিন পর্য্যন্ত লিন্‌কন্ সত্যিকারের ভালো খাদ্য কাহাকে বলে, তাহার আস্বাদ পান নাই।

সেই নির্জ্জন অরণ্যে কোন খেলার সাথীও মিলিত না। দূরে-দূরে দুই-একঘর করিয়া লোকের বসতি ছিল বটে কিন্তু তাহাদের সহিত কাহারও আত্মীয়তা ছিল না। কেউ কাহাকে যেন জানিত না---চিনিত না! সেই বনবাসের মধ্যে ছোট্ট লিন্‌কনের একমাত্র আনন্দের আশ্রয় ছিল তাঁহার মা। মা যাহা বলিতেন, বালক সকল মন দিয়া তাহা শুনিত এবং তাহার অন্যরূপ কিছু করিতে বা বলিতে তাহার মন চাহিত না। তাঁহার মা একদিন গল্প করিতে-করিতে বলিয়াছিলেন, বাবা, সৈন্যদের সম্মান করবে…দেশের জন্যে তারা প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত নয়…

একদিন সারাদিনের চেষ্টার ফলে বালক লিনকন্ ছিপে একটী মাছ ধরিতে পারিয়াছেন। তাঁহার আনন্দ আর দেখে কে? সেই মাছ লইয়া বনের ভিতর দিয়া তিনি বাড়ী ফিরিতেছেন, এমন সময় পথে হঠাৎ একজন সৈনিকের সঙ্গে তাঁহার দেখা। সৈনিক পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেই বালকের মায়ের সেই

কথা মনে পড়িয়া গেল···সৈনিকদের সম্মান কর্‌বে···বালক ছুটিয়া সেই সৈনিকের নিকট গিয়া হাতের মাছটী দিয়া অভিবাদন করিল। পরবর্ত্তী জীবনে জগতের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রত্যেক সৈন্যই জানিত, তাহাদের প্রত্যেকের জন্য তাহাদের সেনাপতি অন্তরে অন্তরে কতখানি অনুভব করেন! মায়ের সেই ছেলেবেলাকার শিক্ষা তিনি জীবনে কখনো ভোলেন নাই।

এই সময় সেই মাকে হঠাৎ হারাইতে হইল। সে অঞ্চলে কি এক ব্যাধি দেখা দিল, দেখিতে-দেখিতে প্রত্যেক সংসার হইতে লোকজন সেই অসুখে মারা পড়িতে লাগিল। লিন্‌কনের মা-ও সেই রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করিলেন। সেই বনবাসে বালকের একমাত্র আশ্রয়-স্থল মৃত্যুর স্রোতে ভাসিয়া গেল।

মায়ের মৃত্যুতে তিনি যে শোক পাইয়াছিলেন, সে শোকের ছায়া সারা-জীবন তাঁহাকে ঘিরিয়া ছিল। পরবর্ত্তী জীবনে যখন তিনি জীবনের যাহা-কিছু কাম্য, তাহার সব-কিছুই পাইয়াছিলেন,—তখনও সেই শোক তিনি ভুলিতে পারেন নাই। সব হাসি-আনন্দের মধ্যে তিনি নিজের মনে কখনও যেন সত্যকারের আনন্দ পান নাই!

তাঁহার পিতা আবার বিবাহ করেন। লিন্‌কনের সৌভাগ্য যে তাঁহার বিমাতা কোনদিন তাঁহার সহিত কোন

রূঢ় ব্যবহার করেন নাই। বিমাতাকে তিনি আপন জননীর মত শ্রদ্ধা করিতেন। মায়ের মৃত্যুর পর মায়ের বাক্স হইতে বালক খানকতক বই পান—একখানি বাইবেল, পিল্‌গ্রিম্‌স্ প্রগ্রেস্, ঈশপের গল্প, আর রবিন্‌সন্ ক্রুশো…সেই বইগুলি বালকের প্রতি মুহূর্ত্তের সাথী হইল।

কোনো বই একবার শেষ হইয়া গেলে, আর-একবার পড়েন …এইভাবে সেই কখানি বই বারবার আদ্যোপান্ত পড়িতে-পড়িতে তাহার প্রত্যেকটি অক্ষর, কমা, সেমিকোলন পর্য্যন্ত বালকের মুখস্থ হইয়া গেল। আপনার মনে সেই সব লেখা হইতে তিনি নিজেকে প্রশ্ন করিতেন, আবার নিজেই তাহার উত্তর দিতেন। এইভাবে পড়ার ফলে, বেশী বই না পড়িলেও, সেই কয়েকখানি বই অমনি গভীরভাবে পড়ার দরুণ, তাঁহার মনের শিক্ষা সকলের অজ্ঞাতে অসাধারণভাবে বাড়িয়া গেল। নিজের মনে তিনি নিজের চিন্তা লইয়া খেলা করিতেন। হয়ত আপনার মনে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন, নিজের মন হইতে ভাবিয়া একটা উত্তর ঠিক করিলেন। তাহাতেও তাঁহার মনের জিজ্ঞাসা মিটিল না। তিনি নিজেকে নিজেই আবার প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, কেন তিনি ঐ রকম ভাবিলেন? অন্য রকমও ত ভাবিতে পারিতেন!

স্কুল ছিল না, উপযুক্ত বই ছিল না, কোন শিক্ষক ছিল না,
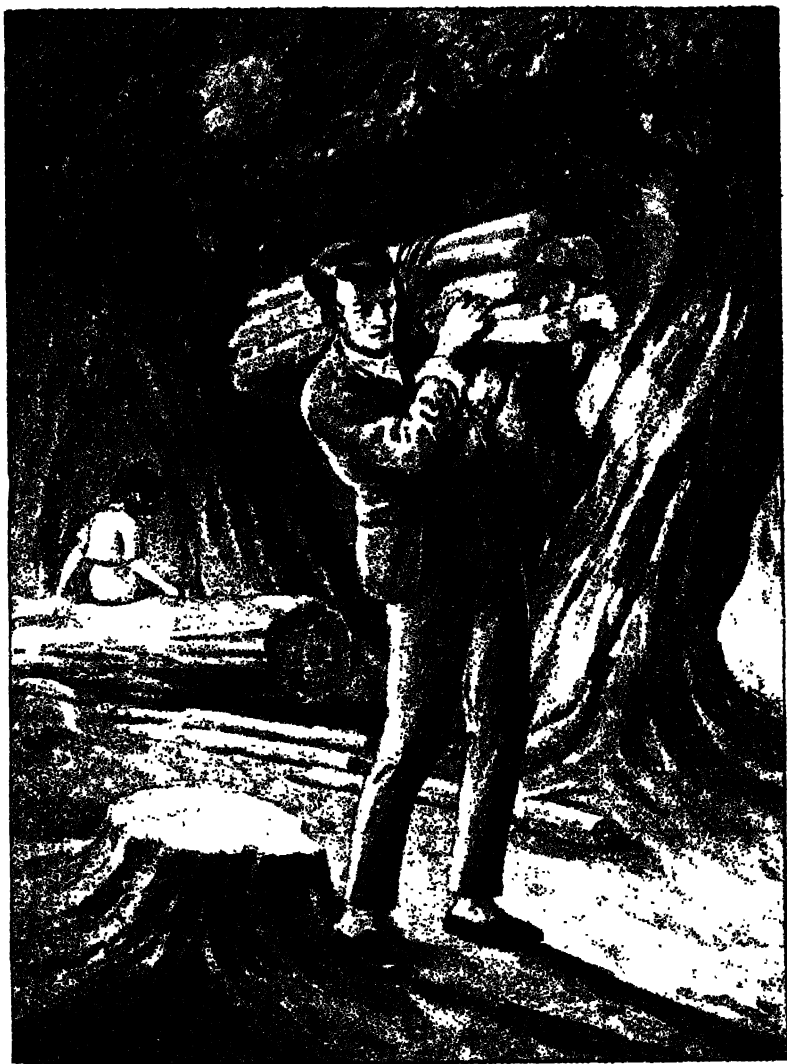
আব্রাহাম্ ঘাড়ে করিয়া বোঝা লইয়া আসেন

তবুও যাহাদের মন জাগ্রত হয়, তাহাদের শিক্ষার অভাব হয় না। যাহারা চলিতে যায়, তাহাদের পায়ের তলায় পথ আপনা হইতে জাগিয়া উঠে।

এই সময় আর একখানি বই এক সুযোগে তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িল---জর্জ্জ ওয়াশিংটনের জীবনী। তাঁহাদের বাড়ীর কাছে এক চাষী-গৃহস্থের বাড়ীতে সেই বইখানি তিনি দেখিতে পান। বহু মিনতি করিয়া সেই বইখানি তিনি কয়েকদিনের জন্য চাহিয়া আনিলেন। বইখানি বাড়ীতে আনিয়াই তিনি মাচায় উঠিলেন। কয়েক পাতা পড়িয়াছেন এমন সময় তাঁহার ঘন ঘন ডাক আসিতে লাগিল। বইখানি সেখানে রাখিয়া তিনি নামিয়া আসিলেন। বিশেষ দরকারী কাজে তাঁহাকে বাহির হইতে হইল। এমন সময় হঠাৎ অঝোর ধারায় বর্ষা নামিল। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, জলে বইখানি ভিজিয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়াছে···

বালকের মন কাঁদিয়া উঠিল, যাহার বই সে কি বলিবে? তাড়াতাড়ি তাহার নিকট গিয়া লিন্‌কন্ ব্যাপারটা বলিল··· তাহারই অসাবধানতার ফলে বইটী নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বালকের কথা শুনিয়া সেই লোকটী বলিল, বেশ তো, তুমি এক কাজ কর···তিন দিন অমনি আমার ক্ষেতে মজুরের কাজ করে দাও···তার বদলে বইটা আর আমি ফেরৎ চাই না!

বালকের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তিনদিন মজুরের খাটুনি খাটিয়া সেই বইখানি তিনি অর্জ্জন করিলেন।

আমি ভাবি, অজস্র বই-এর মধ্যে বাস করিয়া যে-সব ছেলে একখানি বই-এর পাতাও খুলিয়া দেখে না—তাহারা কি বুঝিবে, তিনদিন মজুরী খাটিয়া সেই একখানি পুরাণো বই অর্জ্জন করিয়া বালক লিন্‌কন্ যে বিরাট আনন্দের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন? প্রতিদিন কাণের কাছে শুনি, অভাব, অভাব… মনে হয় অভাব টাকার নয়, অভাব আয়োজনের নয়, অভাব হইল মনের।

সেই একখানি বই লিন্‌কনের জীবনের ধারাকে বদলাইয়া দিল। বার-বার করিয়া সেই বইখানি তিনি প্রথম পাতা হইতে শেষ পাতা পর্য্যন্ত পড়িলেন। পড়িতে-পড়িতে, বালকের চোখের সামনে আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের জন্মদাতা, স্বাধীনতার পূজারী সেই মহাপুরুষটী যেন সজীব হইয়া উঠিল—সেই জন-বিরল বনের বাহিরে বৃহৎ জগতের দিকে তিনি চাহিয়া দেখিতে শিখিলেন; নির্জ্জন বন-পথে চলিতে-চলিতে তিনি কল্পনা করেন যেন জর্জ্জ ওয়াশিংটনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে—আপনার মনে তিনি সাড়া দিয়া ওঠেন…

তখন কে জানিত যে, জর্জ্জ ওয়াশিংটনের অপূর্ণ ব্রত সম্পূর্ণ করিবার ভার বিধাতা তাঁহারই উপর দিয়াছেন!

এতদিন সেই বনের মধ্যে যে চুপটী করিয়া বসিয়া ছিল, সহসা সে যেন শুনিল, বনের বাহিরে বিরাট বিশ্ব হইতে অবিরাম আহ্বান আসিতেছে! কাহারা যেন কোথাও তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে! এক অপূর্ব্ব অস্থিরতা তাঁহার মনকে উদ্বেল করিয়া তুলিল। তাহার প্রেরণায় তিনি অদ্ভুত সব কাণ্ড করিতে লাগিলেন। কখনো বনের মধ্যে চলিতে-চলিতে হঠাৎ থামিয়া যান, অনেকক্ষণ যেন কাহারও সহিত কথা বলেন···কখনো বা গাছের উপর উঠিয়া অনর্গল বক্তৃতা দিয়া চলেন···কখনো আপনার মনে সেই কয়েকখানি পরিচিত বই হইতে পাতার পর পাতা আবৃত্তি করিয়া চলেন···

যাহারা ছেলেবেলা হইতে তাঁহাকে দেখিয়াছে, তাহারা হঠাৎ তাঁহার এই পরিবর্ত্তনে একটু অবাক হইয়া গেল। তাহারা ভাল করিয়া ছেলেটাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল এবং লক্ষ্য করিতে-করিতে তাহারা দেখিল যে, ছেলেটী কখন তাহাদের প্রত্যেকের হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছে! কখনো কোন মিথ্যা কথা সে বলে না, কোন অসাধু বা নীচ কাজ সে করে না··· এমন কি হাতে বন্দুক লইয়া বনে বাস করিয়াও সে একটী প্রাণীকেও আঘাত করিতে চায় না···প্রত্যেক প্রতিবেশী যখনি লিন্‌কনের কথা উল্লেখ করিত, তখনি আদর করিয়া বলিত, "অনেষ্ট আবে"। লিন্‌কনের ডাক নাম ছিল, আবে।

এই ভাবে সেই বনবাসে জীবনের প্রথম আঠারো বৎসর কাটিয়া গেল। আঠারো বৎসর বয়সে তাঁহার চেহারা দৈর্ঘ্যে এ রকম হইল যে, সে রকম লম্বা লোক সে অঞ্চলেই আর কেউ ছিল না। সেই বনের বৈচিত্র্যহীন জীবন ক্রমশ তাঁহাকে পীড়া দিতে লাগিল। বাহিরের জগৎ দেখিবার জন্য তাঁহার মন আকুলি-বিকুলি করিত। এই সময় তাহার প্রথম সুযোগ আসিল।

তাঁহারা যে-অঞ্চলে থাকিতেন, সেখানকার এক ধনী লোক তাঁহার ছেলেকে নৌকা করিয়া ভিন্ দেশে পাঠাইতে-ছিলেন। নৌকায় নানারকমের জিনিস-পত্র সব ছিল। নানান্ জায়গায় বাজারে সেই সব জিনিষ বিক্রী করিতে হইবে। ওহি-ও নদী বাহিয়া নৌকা যাইবে—পথে যে সব শহর পড়িবে, সেখানে-সেখানে নৌকা বাঁধিয়া সেই সব জিনিষ বিক্রয় করিতে হইবে। তাঁহার ছেলেকে সাহায্য করিবার জন্য সেই ভদ্রলোক একজন লোক খুঁজিতেছিলেন।

লিন্‌কনের সাধুতার কথা তিনি জানিতেন, সেইজন্য তাঁহার পিতার নিকটে আসিয়া তিনি লিন্‌কন্‌কে তাঁহার ছেলের সহিত পাঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। লিন্‌কনের পিতা সম্মত হইলেন। মহা-আনন্দে লিন্‌কন্ জগৎ দেখিতে বাহির হইলেন। তাঁহার সঙ্গীর নাম হইল এ্যালান জেন্‌ট্রি।

তখন আমেরিকার পথে-প্রান্তরে মৃত্যু নানারূপ ধরিয়া ঘুরিয়া ফিরিত। বিশেষ করিয়া, যাহারা য়ুরোপীয়ান্, পথে তাহাদের বিপদের ইয়ত্তা ছিল না। "জলে কুমীর এবং ডাঙ্গায় বাঘ" ছাড়া যে-কোন গাছের আড়াল হইতে, যে-কোন নদীর বাঁকে, সহসা রেড্-ইণ্ডিয়ান্‌দের সহিত দেখা হইয়া যাইতে পারে এবং সে-দেখা মানেই শক্তি-পরীক্ষা।

একদিন রাত্রিবেলায় নদীর ধারে নৌকা বাঁধিয়া তাঁহারা রাত্রির মত বিশ্রাম করিতেছিলেন। ক্লান্ত হইয়া সেদিন দুজনেই ঘুমাইয়া পড়েন। হঠাৎ লিন্‌কনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আশে-পাশে নদীর জলে তাঁহার যেন মনে হইল অন্ধকারে কাহারা যেন অগ্রসর হইয়া আসিতেছে!

তাড়াতাড়ি জেন্‌ট্রিকে জাগাইয়া তুলিয়া, বন্দুক হাতে তিনি নৌকার বাহিরে আসিয়া দেখেন, তাঁহার অনুমান সত্য! রেড্-ইণ্ডিয়ান্‌রা তাঁহাদের নৌকা ঘিরিয়া ফেলিয়াছে! অন্ধকারে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িতেই বোঝা গেল যে, কে যেন জলে পড়িয়া গেল···সঙ্গে-সঙ্গে আরো দুই-তিনবার বন্দুক ছোঁড়ার পরে অন্ধকারে তাঁহার মাথায় পাশ দিয়া সোঁ করিয়া বর্শা চলিয়া গেল···আর কয়েক ইঞ্চি সরিয়া আসিয়া লাগিলে ···সে-যাত্রা আর বাড়ী ফিরিয়া আসিতে হইত না।

বন্দুকের সঙ্গে লড়াই করা বৃথা মনে করিয়া, আক্রমণকারী

অন্ধকারে গা ঢাকা দিল। বন্দুক-হাতে দুই বন্ধু তীরে নামিয়া তাহাদের তাড়া করিলেন কিন্তু ঘন বনের মধ্যে তাহারা কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, তাহা তাঁহারা টের পাইলেন না।

যে কাজ লইয়া তিনি বিদেশ-যাত্রা করিয়াছেন, অবশেষে তাহা ভাল ভাবেই সম্পন্ন করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। যে ব্যবসায়ী তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন, বেচা-কেনার হিসাব হইতে তিনি লিন্‌কনের সাধুতার বিষয় বুঝিতে পারিয়া তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। ছেলেবেলা হইতে 'অনেস্ট' অর্থাৎ 'সাধু' বলিয়া তাঁহার যে খ্যাতি ছিল, তাহা লোকের মুখে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল।

এই সময় লিন্‌কনের বাবা আবার স্থান-ত্যাগের সংকল্প করিলেন। বেদেদের মত সর্ব্বদাই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় তিনি ঘুরিয়া বেড়ান। তিনি তাঁহার এক আত্মীয়ের নিকট হইতে জানিতে পারিলেন যে, আরো উত্তরে ইলিনয়স্-অঞ্চলে বসবাসের বেশ ভাল জায়গা আছে। এখানকার বাড়ী-ঘরদোর তুলিয়া গাড়ীতে মাল বোঝাই করিয়া তাঁহারা আবার যাত্রা করিলেন।

তখন বর্ষাকাল। পথ-ঘাট কাদায় ভরিয়া গিয়াছে। কোন-কোন জায়গায় প্রায় এক হাঁটু কাঁদা। সেই কাদা-জল ঠেলিয়া লিন্‌কনরা ইলিনয়স্-অঞ্চলে উঠিয়া আসিলেন।

লিন্‌কনের সাধুতার কথা আর একজন ব্যবসায়ীর কাণে উঠিতে, তিনিও ঠিক করিলেন যে, তিনি তাঁহার মাল-পত্র দিয়া লিন্‌কন্‌কে পাঠাইবেন। এই লোকটীর নাম হইল অফাট্।

অফাট্ শুধু যে একজন সাধু-স্বভাবের লোক খুঁজিতেছিলেন, তাহা নয়, তিনি সেই সঙ্গে একজন সত্যিকারের মাথাওয়ালা ছেলেরও খোঁজ করিতেছিলেন। লিন্‌কন্‌কে পরখ করিয়া তিনি দেখিলেন যে, লিন্‌কন্ যদিও লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানেন না, কিন্তু তাঁহার ঘাড়ের উপর মাথা বলিয়া একটা জিনিষ আছে, এবং সে মাথার ভিতরে বুদ্ধিও আছে।

তখন তাঁহার একুশ বছর বয়স; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত বিশেষ কিছুই পুঁথি-গত বিদ্যা তাঁহার ছিল না। এমন কি, তখন পর্য্যন্ত তিনি ভাল করিয়া লিখিতে পারিতেন না। এই সময়কার তাঁহার হাতের লেখা সম্বন্ধে পরে তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাকে লেখা বলতেও পার, খরগোসের পায়ের ছাপও বলতে পার...এই পুঁজি লইয়া তিনি অফাটের নৌকা লইয়া জগৎ দেখিতে বাহির হইলেন।

এইবার তিনি প্রথম সাক্ষাৎ ভাবে নিজের চোখে ক্রীতদাস-প্রথার ব্যাপার দেখিলেন। নিউ অর্লিয়েন্‌স্ শহরে তখন এই মানুষ বেচা-কেনার একটা মস্তবড় বাজার ছিল। বাজারে যেমন ভাবে আলু-পটল মাছ বিক্রী হয়, ঠিক সেইভাবে তখন

হতভাগ্য নিগ্রোদের আনিয়া বেচা-কেনা হইত। হাতে-পায়ে শৃঙ্খল-বাঁধা অবস্থায় ছেলেমেয়ে বুড়ো-জোয়ান্ সকলকে বাজারে আনা হইত। এক-একজন ব্যবসায়ীর এক-একটা আলাদা দোকান। লোকে দর করিয়া সেই সব মাল কিনিয়া লইয়া যাইত।

নিউ অর্লিয়েন্সের সেই মানুষ-বেচা-কেনার হাটে কৌতূহল বশত বেড়াইতে আসিয়া, সেদিন যে দৃশ্য তিনি দেখিলেন, সারা-জীবন তাঁহার মনে তাহা ছাপ রাখিয়া গেল। দেখিলেন, হাটে যে-ভাবে লোকে গরু-ছাগল বেচে, এই সব জ্যান্ত মানুষদের তার চেয়েও ভয়াবহ নিষ্ঠুর ভাবে মানুষ নাড়াচাড়া করিতেছে। বাজারের চারিদিক হইতে অপরিচিত ভাষায় মানুষের কান্না উঠিতেছে, লম্বা বেত হাতে মালিকরা নির্ম্মমভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ সেই হতভাগ্য জীবদের প্রহার করিতেছে, কালো চামড়া ফাটিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে...

এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া লিন্‌কন্ শিহরিয়া উঠিলেন কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার তিনি দেখিলেন যে, তাহাতে কেহই বিন্দুমাত্র ব্যথিত নয়। যেন ইহা খুব একটা স্বাভাবিক ঘটনা! যাহারা কিনিতে আসিয়াছে, তাহাদের ব্যবহারও সমান নির্ম্মম! পায়ের লাথি দিয়া তাহারা ক্রীতদাসদের নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতেছে। চোখের সামনে মায়ের পাশ হইতে সন্তানকে

কেহ কিনিয়া লইয়া গেল, বুড়ো বাপের পাশ হইতে তাহার জোয়ান ছেলেদের কেহ কিনিল···সেই শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থাতেও বৃদ্ধ পিতাকে ছাড়িয়া যাইতে ছেলেদের মন ফাটিয়া পড়িতেছিল···তাহারা নড়িতে চাহে না···যিনি কিনিয়াছেন, তিনি বেত মারিতে-মারিতে তাহাদের টানিয়া লইয়া গেলেন··· ধূলায় লুটাইয়া যাইতে-যাইতে রক্তে ধূলা কাদা হইয়া উঠিতেছে ···এত বড় ভয়াবহ দৃশ্য—লিন্‌কন্ স্তব্ধ-বিস্ময়ে দেখিলেন যে, মানুষ বিনা সঙ্কোচে দেখিয়া চলিয়াছে!

সেইদিন হইতে তাঁহার অন্তরে মানব-সভ্যতার এই কুৎসিততম ঘটনা যে গভীর প্রভাব ফেলে, সমস্ত জীবন দিয়া তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই জঘন্যতম পাপ হইতে মানব-সমাজকে রক্ষা করিতে। এবং সেই সাধনায়, তিনি জয়ী হইয়াছিলেন···এবং সেই জয়ের মূল্য-স্বরূপ তাঁহার জীবনকে আহুতি দিতে হয়।

অফাটের নৌকা লইয়া বেচা-কেনা শেষ করিয়া তিনি যখন ফিরিলেন, অফাট্ তাঁহার কাজে খুব সন্তুষ্ট হইলেন। নিউ সালেম শহরে অফাটের একটা বড় দোকান ছিল, সেই দোকানের পেছনে তাঁহার একটা কলও ছিল। সেই দোকানে, মানুষের যে-যে জিনিষ দরকার, সবই বিক্রী করা হইত। অফাট লিন্‌কন্‌কে সেই দোকানে চাকরী দিলেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে লিন্‌কন্ সেই দোকান আর কলের সব কাজ তদারক করিতে লাগিলেন। এক মুহূর্ত্তও তিনি অলস ভাবে বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। সামান্য কর্ম্মচারী হইয়া তিনি সেই দোকানে ঢুকিয়াছিলেন। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট যেটুকু কাজ, তাহাই কোন মতে সারিয়া তিনি মাসের শেষে বেতন লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন; কিন্তু যাহারা কাজ ভালবাসে, তাহারা সে ভাবে শুধু বেতনের জন্য কাজ করিতে পারে না।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে অফাট্ দেখিলেন যে, তাঁহার কর্ম্মচারীর চেষ্টায় এবং পরিশ্রমে তাঁহার ব্যবসা দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। এই কাজের মধ্যেও লিন্‌কন্ কিন্তু তাঁহার ছেলে-বেলার সেই পড়ার অভ্যাসের বিষয় ভোলেন নাই। সেদিন বই সংগ্রহ করা যে রকম দুরূহ ছিল, আজ আর তাহা সেরকম দুরূহ নয়। লিন্‌কন্ চারি দিক হইতে বই সংগ্রহ করিয়া পড়িতে লাগিলেন।

অফাট্ তাঁহার কর্ম্মচারীর গুণে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। সারাদিন অক্লান্ত ভাবে সে পরিশ্রম করিতে পারে; বই-এর ভাষায় সে কথা বলিতে পারে; প্রয়োজন হইলে যে কোন বলিষ্ঠ লোককে ঘুঁষা দিয়া সায়েস্তা করিতে পারে। সকলের উপরে, টাকা-পয়সা-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাহাকে নির্ভাবনায় বিশ্বাস করিতে

পারা যায়। অফাট্ প্রকাশ্য ভাবে সকলের সাম্‌নে তাঁহার কর্ম্মচারীর গুণগান করিতে আরম্ভ করিলেন। এইভাবে অযাচিত প্রশংসার বাহুল্য লিন্‌কনের আদৌ ভাল লাগিত না। কিন্তু ওফাট্ যেন তাহাতে আনন্দ পাইতেন।

প্রথম-প্রথম লোকে চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল, এবং তাহার কথায় সায় দিতে লাগিল; কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, লোকে ক্রমশ সেই দীর্ঘাকার যুবকটীকে ততই তাহাদের সকলের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া গোপনে ঈর্ষ্যা করিতে লাগিল। বিশেষ করিয়া, ওফাট্ যখন যুবকদের সামনে লিন্‌কনের সাধুতা এবং সেই সঙ্গে তাহার গায়ের জোরের প্রশংসা করিতেন, তাহারা প্রথমে মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে লাগিল। কিন্তু ওফাট্ ক্রমশ এমন মন্তব্য করিতে লাগিলেন যে, নিউ সালেমে লিন্‌কনের মত সাধু আর কোন ছেলে নাই, এবং তাহার সঙ্গে গায়ের জোরে পারে এমন কোন ছেলেও নাই।

ওফাটের এই অযাচিত প্রচার-কার্য্যের ফলে ওফাট্ বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি লিন্‌কনেরই ক্ষতি করিতেছিলেন; কারণ, একদল ছেলে গোপনে-গোপনে লিন্‌কনকে তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ধরিয়া লইয়া তাহার সহিত বল-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। লিনকন্‌ও তাহা জানিতেন না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা কাজ সারিয়া তিনি বাড়ী ফিরিতে-

ছিলেন। এমন সময় এক জন-বিরল পথের বাঁকে একদল ছেলে তাঁহার পথ আটকাইয়া দাঁড়াইল। নিউ সালেমে জোক নামে লিন্‌কনের সমবয়সী একটা ছেলে ছিল। লিন্‌কনের মত লম্বা না হইলেও, তাহার দেহ লিন্‌কনের চেয়ে ঢের বেশী সুগঠিত ছিল। তার কাঁধ দুটা ছিল ষাঁড়ের কাঁধের মত এবং সে রীতিমত কুস্তি করিত। কুস্তিতে কেহ তাহাকে হারাইতে পারে নাই।

কথা নাই, বার্ত্তা নাই, জোক লিন্‌কন্‌কে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করিল। অন্য যে কোনও ছেলে হইলে জোকের বলিষ্ঠ চেহারা দেখিয়া ভয় পাইয়া যাইত। কিন্তু লিন্‌কন্ ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না। তিনি সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

লিন্‌কন্ দেখিতে লম্বাই ছিলেন, কিন্তু তাঁহার দেহে মাংস বিশেষ কিছুই ছিল না। জোক এবং তাঁহার সঙ্গীরা ভাবিয়াছিল, লিন্‌কন্‌কে অনায়াসেই জোক পরাজিত করিবে। কিন্তু কুস্তি আরম্ভ হইলে জোক বুঝিতে পারিল যে, সেই মাংসহীন দীর্ঘ দেহে হাড়গুলি লোহা হইয়া গিয়াছে এবং দুই দীর্ঘ বাহু দিয়া লিন্‌কন্ এমন ভাবে জোককে চাপিয়া ধরিলেন যে, আর্ত্তনাদ করিয়া জোক মাটিতে পড়িয়া গেল। সেইদিন হইতে যুবক-মহলে লিন্‌কনের শক্তির কথা এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল যে, কেহ আর তাহার প্রতিবাদ করিত না।

দেখিতে-দেখিতে লিন্‌কন্ নিউ সালেমের যুবকদের মাথার মণি হইয়া উঠিলেন···আমেরিকার জন-বিরল অরণ্যের সামান্য কাঠের ঘর হইতে লিন্‌কন্ ধীরে-ধীরে আগাইয়া আসিতে লাগিলেন···তবে খ্যাতির রাজপথের সন্ধান তখনও তিনি পান নাই···তখনও সে পথ হইতে বহু দূরে তিনি ছিলেন।

লিন্‌কনের দেহের শক্তির কথার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার সাধুতার কথাও সে অঞ্চলে লোকের মুখে-মুখে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহার সাধুতা সম্বন্ধে একটী ভারি সুন্দর গল্প আছে।

রাত্রিবেলা দোকান বন্ধ করিবার সময় হিসাব মিলাইতে গিয়া তিনি দেখেন যে, তিন পেন্স্ বেশী হইতেছে, মাত্র তিন পেন্স্! নিশ্চয়ই কোন খরিদ্দারের নিকট হইতে ভুলে এই তিন পেন্স্ বেশী লওয়া হইয়াছে। সমস্ত রসিদ একটী-একটী করিয়া মিলাইয়া দেখিতে পাইলেন যে, সকাল বেলা এক বুড়ী কতকগুলি জিনিষ কিনিতে আসিয়াছিল, ভুলক্রমে তাহার নিকট হইতে এই তিন পেন্স বেশী লওয়া হইয়াছে।

লিন্‌কন্ সেই বুড়ীকে চিনিতেন। যতক্ষণ বুড়ীকে সেই তিন পেন্স ফিরাইয়া না দিতে পারিতেছিলেন, ততক্ষণ সেই তিন পেন্স জ্বলন্ত কয়লার মত তাঁহার দেহ যেন জ্বালাইয়া দিতেছিল! দোকানের কাজ শেষ করিয়া রাত্রিবেলা বাড়ী না ফিরিয়া লিন্‌কন্ সেই বুড়ীর বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইলেন।

তখন শীতকাল, রাত্রি গভীর হইয়া আসিতেছিল এবং সেই বুড়ীর বাড়ী প্রায় ছ'-সাত মাইল দূরে ছিল। নিজের কোন কষ্ট ভ্রূক্ষেপ না করিয়া লিন্‌কন্ সেই শীতের রাত্রির অন্ধকারে সেই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া সেই তিনটী পেন্স বুড়ীকে ফেরৎ দিয়া আসিলেন। ফেরৎ দিয়া যেন তাঁহার গা হইতে জ্বর নামিয়া গেল!

এই ভাবে নিজের অসাধারণ সাধুতার দ্বারা লিন্‌কন্ তাঁহার পরিচিত সকলের বিশ্বাস এমন ভাবে অর্জ্জন করিলেন যে, লোকে তাঁহাকে আপনার লোক বলিয়া মনে করিত। বিপদে-আপদে পড়িলে লোকে তাঁহারই কাছে পরামর্শের জন্যে ছুটিয়া আসিত। লিন্‌কন্ ধীর ভাবে প্রত্যেকের কথা শুনিতেন এবং রীতিমত চিন্তা করিয়া প্রত্যেকের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতেন। অপরের দুশ্চিন্তা দূর করিতে পারিলে, তাঁহার আর আনন্দের অন্ত থাকিত না।

শুধু যে ব্যবহারে তাঁহার চরিত্রের এই বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিত, তাহা নয়। তিনি যখন নিজের বাড়ীতে থাকিতেন, তখন প্রায়ই গম্ভীর থাকিতেন; তাঁহার মুখ দেখিলে মনে হইত যে, তাঁহার মনের ভিতর কি যেন গভীর দুঃখ রহিয়াছে, তাহা তিনি চাপিয়া আছেন! কিন্তু যখনি মানুষের সহিত মিশিতেন, সঙ্গীদের দলে আসিয়া বসিতেন, কাহারও মুখভার তিনি সহিতে

পারিতেন না। হাসির গল্প বলিয়া, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া, নানা রকম রসিকতা করিয়া সকলকে আনন্দে মাতাইয়া তুলিতেন।

দোকান, বেচা-কেনা, আড্ডা, সারাদিনের পরিশ্রম, এ সবের মধ্যে তিনি কিন্তু ভোলেন নাই, পড়ার কথা। যতদিন বনবাসে ছিলেন, ততদিন যে-সব লোকের সঙ্গে তাঁহার দুবেলা দেখা হইত, তাহারা সকলে তাহারই মত অশিক্ষিত ছিল, হয়ত বা তাঁহার চেয়ে তাহারা ঢের বেশী অশিক্ষিত ছিল। কিন্তু নিউ সালেমে আসিয়া দোকানে বেচা-কেনা করিতে-করিতে তিনি শিক্ষিত লোকদের দেখা পাইলেন; তাঁহাদের ভাষা, কথা বলিবার ধরণ সম্পূর্ণ যেন স্বতন্ত্র!

যখনই সেই রকম কোন লোক দোকানে আসিতেন, লিন্‌কন্ আগ্রহ-সহকারে তাঁহার সহিত কথা বলিতেন। তাঁহার প্রত্যেকটী কথা, বলিবার ধরণ লক্ষ্য করিতেন; বুঝিতেন, তাঁহারা যে ভাষা বলিতেছেন, তাহা বিশুদ্ধ, তাহাতে ব্যাকরণের ভুল নাই। তাঁহারা সচরাচর যে ভাষা বলেন, তাহা অশুদ্ধ, গ্রাম্য এবং তাহাতে কত না ব্যাকরণের ভুল! এখনও পর্য্যন্ত তিনি ব্যাকরণের চেহারা দেখেন নাই। নিউ সালেমে শিক্ষিত লোকদের সঙ্গে কথা বলিতে-বলিতে তিনি আপনা হইতে অনুভব করিলেন যে তাঁহার ভাষার দৈন্য ও অজ্ঞতা কতখানি! যেমন কোন ময়লা কাপড় পরিয়া কোন ভদ্রসমাজে যাইতে

লোকের মন চাহে না, তেমনি অশুদ্ধ ভাষা উচ্চারণ করিয়া ভদ্রসমাজে অগ্রসর হওয়া যায় না।

লিন্‌কন্ বুঝিলেন, ভাষার শুচিতা উন্নত জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। নিজেকে এই ভাবে টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া দেখিবার ক্ষমতা সকলের থাকে না এবং লিন্‌কনের এই ক্ষমতা ছিল বলিয়া, তিনি কোনও গুরু বা পরিচালকের কোন সাহায্য না পাইয়াও, জীবনের নিম্নতম স্তর হইতে জীবনের সর্ব্বোচ্চ স্তরে উঠিতে পারিয়াছিলেন। যেখানে শিক্ষকের অভাব হয়, সেখানে মানুষ নিজেই নিজের শিক্ষক। লিন্‌কন্ স্থির করিলেন যে, তিনি তাঁহার ভাষাকে শুদ্ধ করিবেন···তাহার জন্য প্রয়োজন একখানি ব্যাকরণের।

তখন আমেরিকায় বই আজকালকার মত সুলভ ছিল না। বহুদিনের চেষ্টার ফলে লিন্‌কন্ জানিতে পারিলেন যে, বারো মাইল দূরে কার্কহাম্ নামক এক শহরে এক জায়গায় একখানা ব্যাকরণ আছে। খবর পাওয়া মাত্র তিনি রওয়ানা হইলেন এবং ব্যাকরণখানি সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। তারপর যখনই সময় পান, দিনের কাজের শেষে রাত্রিবেলা, সেই ব্যাকরণখানি লইয়া তাহার প্রত্যেকটী লাইন কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন।

ছেলেবেলায় যখন তাঁহার হাতের কাছে মাত্র খান-কয়েক বই ছিল, সেই বইগুলিই তিনি বার-বার করিয়া পড়িয়া শেষ

হাতের মাছটী দিয়া অভিবাদন করিল

করিতেন ; তেমনি সেই ব্যাকরণখানি তিনি বার-বার পাঠ করিয়া শেষ করিয়া ফেলিলেন। এইভাবে তিনি নিজের চেষ্টায় এবং একান্ত ভাবে নিজের অনুপ্রেরণায় নিজেকে এমন ভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলিলেন যে, তাঁহার লেখা এবং বক্তৃতা দেওয়া ইংরাজী ভাষা আজও পর্য্যন্ত ইংরাজী ভাষাভাষী লোকেরা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন ; লিন্‌কনের লিখিত কিংবা উচ্চারিত ইংরাজী ভাষা হইল, ইংরাজী গদ্যের আদর্শ। অথচ কোন স্কুল, কোন বিশ্ববিদ্যালয়, কোন বিখ্যাত বা অখ্যাত গুরুর নিকট হইতে কোন পাঠ লইবার কোন সুযোগ তিনি পান নাই। এইজন্যই আরবরা বলিয়া থাকেন, যাহার অন্তরে ইচ্ছা আছে, সে মরুভূমির মধ্য হইতেও পথ করিয়া লইতে পারে।

কিন্তু ওফাটের দোকান বেশী দিন চলিল না। তাহার প্রধান কারণ, ওফাট নিজে। কথা বলা ছিল তাঁহার নেশা... এত কথা যে বলে, কাজ তাহার দ্বারা হয় না। শুধু লিন্‌কনের সাধুতায় দোকান আর বেশীদিন টিকিল না। যখন বিশেষ কোন লাভের আর সম্ভাবনা দেখিলেন না, ওফাট দোকান তুলিয়া দিলেন। লিন্‌কন্ বেকার হইয়া পড়িলেন।

এই সময় ইলিনয়স্-অঞ্চল সহসা বিপন্ন হইয়া উঠিল। ব্ল্যাক হক নামে এক দুর্দ্দান্ত রেড্ ইণ্ডিয়ানের নেতৃত্বে রেড্ ইণ্ডিয়ান্‌রা ইলিনয়স্ আক্রমণ করিল। ওফাটের দোকানের

কাজ ছাড়িয়া দিয়া লিনকন্ সৈনিক হইলেন। ব্লাক হকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য ইলিনয়স্ হইতে যে সেনাবাহিনী গঠিত হইতেছিল, লিন্‌কন্ তাহাতে যোগদান করিলেন এবং ক্যাপ্‌টেনের পদ লইয়া তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। কিন্তু যুদ্ধ বেশীদিন হইতে না হইতে শেষ হইয়া গেল। ব্ল্যাক হক বন্দী হইলেন।

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিবার সময় একদিন রাত্রিবেলায় তাঁবু হইতে লিন্‌কনের ঘোড়া চুরি গেল। সঙ্গে যে কয়েকজন সৈনিক ছিল, তাহাদেরও ঘোড়া চুরি গিয়াছিল। সুতরাং তাঁহাকে পায়ে হাঁটিয়া ইলিনয়সে ফিরিয়া আসিতে হইল।

যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন তখন দেশের মধ্যে ইলেক্‌-শনের আন্দোলন সুরু হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় শাসন-পরিষদের সভ্য-নির্ব্বাচনের জন্য এই ইলেক্‌শন্। বন্ধুদের অনুরোধে লিন্‌কন্ এই ইলেক্‌শনে সভ্য-পদপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন। অরণ্যের বুনো পথ হইতে এইবার তিনি খ্যাতির রাজপথের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে যখন তিনি ফিরিলেন তখন নির্ব্বাচনের দিনের আর বিশেষ দেরী ছিল না। সুতরাং তিনি বিশেষ কোন প্রচার-কার্য্য করিতে পারিলেন না। আর তখন নিউ সালেমে অনেকে তাঁহাকে চিনিলেও, সমস্ত

প্রদেশের মধ্যে তাঁহাকে সাক্ষাৎভাবে কেহ একটা বড় চিনিত না।

নির্ব্বাচনের ফল যখন বাহির হইল তখন দেখা গেল যে, তিনি নির্ব্বাচিত হন নাই। এখনও সময় আসে নাই, তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। তিনি অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। কিন্তু এই নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বের মধ্যে আসিয়া পড়ার দরুণ, তাঁহার মনে এতদিনকার ঘুমন্ত বাসনা সব জাগিয়া উঠিল…ক্যান্‌টাকীর জন-বিরল অরণ্যের মধ্যে জীবনের যে-পথ তিনি খুঁজিয়া ফিরিতেছিলেন, আজ সহসা সেই পথের দিশা তিনি পাইয়া গেলেন…জর্জ্জ ওয়াশিংটনের জীবন-কাহিনী পড়িতে-পড়িতে একদা প্রথম জীবনে নিজের মনে অস্পষ্ট যে সব বাসনার অঙ্কুর মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহারা যেন পত্র-বাহু মেলিয়া জাগিয়া উঠিল…তাঁহার একক জীবনের ধারা বহু-মানবের জীবনের ধারার সঙ্গে মিলাইয়া মিশাইয়া দিবার এই তো পথ!

লিন্‌কন্ নির্ব্বাচনে পরাজিত হইলেন বটে কিন্তু সেই অল্পদিনের অভিজ্ঞতায় তিনি নিজে এবং তাঁহার আশেপাশে যাহারা ছিল, জানিতে পারিলেন যে, এই পথে অগ্রসর হইতে হইলে বক্তৃতা দিবার ক্ষমতা থাকা চাই এবং সে-ক্ষমতা লিন্‌কনের ছিল। সেদিন লিন্‌কন্ তাহা আবিষ্কার করিলেন।

সে-সময় সভা-সমিতি আজকালকার ঠিক এই রকম কেতা-দুরস্ত ভাবে পরিচালিত হইত না। যাঁহাকে মুখের কথা দিয়া জনতাকে বশ করিতে হইত, অনেক সময় দরকার হইলে, তাঁহাকে মুখের কথা ছাড়িয়া, গায়ের জোরও পরীক্ষা করিতে হইত। এই নির্ব্বাচনের সময় লিন্‌কন্ তাঁহার কয়েকজন বন্ধু লইয়া এক জায়গায় বক্তৃতা দিতে গিয়াছেন। বক্তৃতার মাঝামাঝি তিনি দেখিলেন, জনতার মধ্যে একজন বলিষ্ঠ লোক তাঁহার এক বন্ধুর গলা টিপিয়া ধরিয়াছে।

আস্তে-আস্তে বক্তৃতা দিবার উঁচু জায়গা হইতে নামিয়া তিনি গম্ভীরভাবে সেই লোকটীর নিকটে আসিয়া, দুই সুদীর্ঘ হাত দিয়া তাহাকে একরকম ছুঁড়িয়া সভার বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। সহসা এইভাবে লাঞ্ছিত হইয়া লোকটী লজ্জায় সেইখানে পড়িয়াই রহিল। লিন্‌কন্ ফিরিয়া আসিয়া আবার যেমন বক্তৃতা দিতেছিলেন, তেমনি বক্তৃতা দিতে লাগিলেন।

নির্ব্বাচনে বিফল-মনোরথ হইয়া লিন্‌কন্ স্থির করিয়াছিলেন যে, তিনি কামারের কাজ করিবেন। নিজে কামারশালা তৈরী করিয়া সেখানে লোহার কাজ করিবেন। কিন্তু সেই সময় বেরী নামে একজন লোকের সঙ্গে তাঁহার ভাব হইয়া গেল।

বেরী একটা দোকান খুলিবার চেষ্টায় ছিল। দোকান-চালানোর ব্যাপারে লিন্‌কনের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল।

তাই বেরী লিন্‌কন্‌কে অংশীদার করিয়া লইয়া এক দোকান খুলিল। কিন্তু দোকান বেশীদিন চলিল না। বেরী লোকটা মোটেই ভাল ছিল না। পরিশ্রম করিয়া ন্যায্য লাভ করার চেয়ে অসৎ উপায়ে সে রাতারাতি বড়লোক হইবার ফন্দী খুঁজিত···তাহার উপর সে প্রচুর মদ্যপান করিত। দোকানের অবস্থা খুব খারাপ হইয়া আসিতে লাগিল, এমন সময় বেরী নিজে মারা পড়িল।

দোকান তো উঠিয়া গেল, কিন্তু লিন্‌কনের ঘাড়ে বহু দেনা আসিয়া পড়িল। সে সব দেনা তিনি অস্বীকার করিলেন না····এমন কি, বেরী যেসব দেনা দোকানের নামে করিয়াছিল, তাহার পরিশোধের সম্পূর্ণ দায়িত্ব লিন্‌কন্ গ্রহণ করিলেন। "অনেষ্ট" বলিয়া যে খ্যাতি তিনি বালককাল হইতে অর্জ্জন করিয়াছিলেন, আজীবন তিনি তাহার মর্য্যাদা দিয়া আসিয়াছেন।

মাথায় দেনার বোঝা লইয়া তিনি কাজ খুঁজিতে লাগিলেন ···সৌভাগ্যবশতঃ সেই সময় তাঁহার এক চাকরী জুটিয়া গেল··· নিউ সালেমের পোষ্ট-অফিসের পোষ্ট-মাষ্টার,---সরকারী চাকরী। এই তাঁহার জীবনে প্রথম সরকারী চাকরী,---দ্বিতীয় চাকরী তিনি পান, একেবারে যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি।

এই নূতন কাজে তাঁহার পড়িবার প্রচুর সুযোগ মিলিল। ছোট্ট পোষ্ট-অফিস, কাজ তেমন কিছুই ছিল না। ডাকে যে

সব কাগজ আসিত, সেগুলি পড়িয়া তবে বিলি করিতে দিতেন। এই সময় তিনি আবার দিবারাত্র, যখনই সময় পাইতেন, পড়িতে লাগিলেন।

তাঁহার নিজের ইচ্ছামত বই-পত্র অবশ্য তিনি সংগ্রহ করিতে পারিতেন না কিন্তু তিনি এলোমেলো ভাবে পড়িতেন না এবং যাহা পড়িতেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতেন ঢের বেশী।

এই সময় দুই বিষয় তাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করে, আইন এবং জরিপ। পোষ্ট-মাষ্টারের কাজ করিতে-করিতে তিনি এই দুই বিষয়ের বই সংগ্রহ করিয়া পড়িতে লাগিলেন এবং দেখিতে-দেখিতে সে অঞ্চলে এই দুই বিষয়ে যত বই ছিল, তাহা পড়িয়া শেষ করিয়া ফেলিলেন।

তখন তাঁহার বয়স মাত্র পঁচিশ বৎসর। এই সময় আবার ইলেক্‌শনের সময় আসিল। লিন্‌কন্ আবার সভ্যপদপ্রার্থী হইয়া নির্ব্বাচনে দাঁড়াইলেন। এক সভায় যখন তিনি বক্তৃতা দিতেছিলেন, সেই সময়, সভার মধ্য হইতে তাঁহার বিরুদ্ধ দলের একজন লোক চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "বলি, আপনার দলে আপনার চেয়ে যোগ্য লোক আর কেউ কি ছিল না?"

লিন্‌কন্ তাহার কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, দুঃখের বিষয়, নাই...শুধু তাঁহার দলে নয়, অপর

কোন দলেও নাই…যতগুলি সভ্য আজ নির্ব্বাচনে দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের সকলে মিলিয়া যাহা পড়াশোনা না করিয়াছে, তিনি একা তাহা করিয়াছেন।

তরুণ যুবকের মুখে তাহা গর্ব্ব-বাণী বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহা সত্য। জীবনের যুদ্ধে মাঝে-মাঝে আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য গর্ব্ব-বাণীরও প্রয়োজন আছে ঃ তবে সে গর্ব্ব-বাণী শূন্যগর্ভ হইলে তাহা হইতে কোন সুফল না ফলিবারই সম্ভাবনা। আমরা জানি লিন্‌কনের সে গর্ব্ববাণী শূন্যগর্ভ ছিল না।

লিন্‌কন্ এবার জয়ী হইলেন। ক্যান্‌টাকীর অরণ্যের বনোপথ হইতে এবার তিনি খ্যাতির রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন…কিন্তু এই পথের শেষ…আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের সভাপতির আসন…সেখান থেকে এখনো বহুদূরে…

লিন্‌কন্ ইলিনয়স্ ষ্টেটের শাসন-পরিষদে সভ্য হইয়া প্রবেশ করিলেন এবং পর-পর তিন নির্ব্বাচনে তিনি সভ্য হইয়াই থাকেন। প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তর নির্ব্বাচন হইত। সুতরাং সবশুদ্ধ আটবৎসর কাল তিনি ইলিনয়স্ ষ্টেটের শাসন-পরিষদের সভ্য হইয়া ছিলেন। এই সময় উপজীবিকার জন্য তিনি গ্রাম্য ছোট ছোট আদালতে ওকালতী করিতেন।

এই সব ছোট ছোট আদালতে ওকালতী করিবার জন্য তখন কোন বিশেষ পরীক্ষা বা লাইসেন্স নেওয়ার

প্রয়োজন ছিল না। চার বৎসর নিউ সালেমে থাকিবার পর, ইলিনয়সের শাসন-পরিষদ সেই ষ্টেটের রাজধানী স্প্রিংফিল্‌ড্‌ শহরে উঠিয়া যায়। স্প্রিংফিল্‌ড-এ আসিয়া লিন্‌কন্ আইন পরীক্ষা দিয়া বড় আদালতে ওকালতী করিতে লাগিলেন।

ইলিনয়সের শাসন-পরিষদে যাঁহারা সভ্য ছিলেন, অধিকাংশই তাঁহার মত উকিল বা আইনজীবী ছিলেন এবং তিনি দেখিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন ছাড়া এমন কেহ নাই, যাহাকে তিনি তাঁহার সমকক্ষ মনে করিতে পারেন। কিন্তু একজন লোক ছিলেন, যাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি, প্রতিপত্তি এবং যশ লিন্‌কন্‌কে গোপন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উত্তেজিত করিয়া তুলিল, তাঁহার নাম ষ্টিফেন আর্ণল্‌ড্‌ ডগলাস্।

লিন্‌কন্ যখন সামান্য একজন উকীল, ডগলাস্ তখন সেই ষ্টেটের সব চেয়ে বড় ব্যারিষ্টার...লিন্‌কন্ ইলিনয়স্ ষ্টেটের শাসন-পরিষদের একজন সভ্য, ডগলাস সেই ষ্টেটের তখন সেক্রেটারী। ডগলাস বক্তৃতা দেন, লোকে আগ্রহ-সহকারে শোনে; কারণ, কি করিয়া সুন্দর ভাবে কথার দ্বারা লোকের চিত্তহরণ করিতে হয়, সে কলা-কৌশল ডগলাস্ ভাল করিয়া জানিতেন। তাই বক্তব্য বিষয় হইতে বলিবার কৌশলের উপরই তিনি বেশী জোর দিতেন।

লিন্‌কন্ লোকের ভাল লাগিবে বলিয়া কোন সত্য কথাকে বিকৃত করিয়া সুন্দর করিতে পারিতেন না, বা কোন মিথ্যা কথা উচ্চারণ করিতে পারিতেন না···যাহা সত্য, যাহা সত্য বলিয়া তিনি অন্তরে বিশ্বাস করেন, স্পষ্টভাবে লোকের কাছে তাহাই প্রকাশ করা ছিল, তাঁহার বক্তৃতার একমাত্র কৌশল।

ডগলাসের চোখের সামনে তখনই ছিল, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আসন···কি করিয়া নিজে সেই আসনে গিয়া বসিতে পারিবেন, তাহাই ছিল তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান-চিন্তা···লিন্‌কনের চোখের সামনে ছিল, তাঁহার নিজের দেশ···যে-দেশ জগতের সব সভ্যতার কনিষ্ঠ···যে-দেশকে এই সেদিন জর্জ্জ ওয়াশিংটন মিলিত ও স্বাধীন করিয়া গিয়াছেন···এবং যে-দেশের শাসন-তন্ত্রের মূল-কথা হইল, Charter of Independence··· স্বাধীনতার চুক্তিনামা···সব মানুষ সমান স্বাধীন···সব রাষ্ট্র সমান স্বাধীন···এই সব স্বাধীন মানুষ এবং স্বাধীন রাষ্ট্র পরস্পরের কল্যাণের জন্য একশাসনে মিলিত হইয়া মানবের মুক্তির স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিবে···লিন্‌কনের চোখের সামনে ছিল···জর্জ্জ ওয়াশিংটনের তৈরী সেই স্বাধীনতার চুক্তিনামা···সেই আদর্শ এখনো সম্পূর্ণ মূর্ত্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই···যদি সম্ভব হয়, আমি যতটুকু পারি, সেই

আদর্শের অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিব—বৃহত্তর জগতের সংস্পর্শে আসিয়া লিন্‌কনের মনে সেই বাসনাই জাগিয়া উঠিল···কিন্তু আরো কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তিনি দেখিলেন, মানুষের কল্যাণের পথে, মানুষই সব চেয়ে বড় বাধা।

এইভাবে লিন্‌কন্ যখন ধীরে-ধীরে মানব-ইতিহাসের প্রকাশ্য রাজপথের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছিলেন, সেই সময় আমেরিকার সেই নব-গঠিত যুক্তরাষ্ট্রের জীবনে এমন এক মহাসমস্যা মাথা তুলিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল যে, যাহা লইয়া অচির কালের মধ্যে সমস্ত আমেরিকা এক দীর্ঘ গৃহ-যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িল। মানব-ইতিহাসের সে সমস্যার নাম হইল ক্রীতদাস-প্রথা। কালো নিগ্রোদের রক্তের ছাপ মানব-ইতিহাসের এই অধ্যায়টীকে রক্ত-রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে।

এই ক্রীতদাসদের ব্যাপার লইয়া যুক্তরাষ্ট্র তখন দুভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। উত্তর-অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে ক্রীতদাস-প্রথা আদৌ ছিল না, কিন্তু দক্ষিণ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে তখন ক্রীতদাস-প্রথা পূরো দমে চলিতেছিল। এখানে আমেরিকার শাসন-তন্ত্রের গোড়ার ব্যাপার তোমাদের জানিয়া রাখা দরকার।

আমেরিকার শাসন-তন্ত্র অন্য দেশের শাসন-তন্ত্র হইতে একটু তফাৎ। কতকগুলি বিভিন্ন ষ্টেট বা রাষ্ট্র লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। প্রত্যেক ষ্টেটে তাহার নিজের শাসন-পরিষদ আছে। ষ্টেটের এলাকার মধ্যে যে-সব জিনিস, তাহা ষ্টেটের সেই শাসন-পরিষদেই নির্দ্দিষ্ট হয়। সুতরাং সেদিক হইতে এক ষ্টেটের আভ্যন্তরিক ব্যাপারের সঙ্গে আর এক ষ্টেটের আভ্যন্তরিক ব্যাপারের শাসনের কোন যোগ নাই। কিন্তু এই সব ষ্টেটের প্রতিনিধিদের লইয়া আবার একটী কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদ আছে...সেই কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদ হইল সমগ্র দেশের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা...যুক্ত-রাষ্ট্রের সভাপতি হইলেন এই কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদের অধিনায়ক।

যে-সময়ের কথা আমরা আলোচনা করিতেছি, তখন ক্রীত-দাসদের ব্যাপার লইয়া উত্তর ও দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এক তুমুল বিবাদ মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। উভয় রাষ্ট্রের বাসিন্দারা মনে করিতেন, ক্রীতদাস-প্রথা ভাল নয়; দক্ষিণ-রাষ্ট্রের লোকেরা মনে করিতেন, উহাতে খারাপ কিছু নাই; খারাপ যদিও বা কিছু থাকে, জীবনের অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসের মত তাহা প্রয়োজনীয়। সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা করার প্রয়োজন নাই। উভয় রাষ্ট্রের যাহারা ক্রীতদাস-প্রথাকে জঘন্য বলিয়া জানিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেউ-কেউ এই মত প্রকাশ

করিলেন যে, ভাল হউক আর মন্দ হউক, তাহা লইয়া আলোচনা করিয়া লাভ নাই। গৃহ-বিবাদের ভয়ে তাঁহারা এই দৃষ্টান্তকে ঢাকা দিয়া রাখিতে চাহিলেন।

লিন্‌কন্ যেদিন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার বহুযুগ আগে, এই পাপ আমেরিকার দেহে প্রবেশ করে এবং তখন তাহা এত পুরাণো হইয়া গিয়াছিল যে, দক্ষিণ-রাষ্ট্রের লোকেরা মনে করিত যে, ইহাই সৃষ্টির বিধান, ভগবানের অভিপ্রেত। কোন অন্যায় একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে, তাহা পরিহার করা ব্যক্তিগত জীবনেও যেমন শক্ত, জাতিগত ও সামাজিক জীবনেও তাহা তেমনি দুরূহ। তখন উহার মন্দ দিকগুলি অভ্যাসের সঙ্গে মিশিয়া চোখে আর লাগে না।

এই পাপের জন্য দায়ী ছিল, এক শ্রেণীর ইংরাজ বণিক। তাহারা আফ্রিকা হইতে নিগ্রো-পল্লী উচ্ছেদ করিয়া নিগ্রোদের ধরিয়া আনিত এবং আমেরিকায় আসিয়া বিক্রয় করিত। সেই সময়কার শাদা চামড়াওয়ালা লোকগুলো মনে করিয়াছিল, যে-মানুষের কালো রঙ্, তাহাকে ভগবান পশুর মত খাটিবার জন্যই পাঠাইয়াছেন। জীবনের যত কিছু নোংরা খাটুনির কাজ, তাহা কালো নিগ্রোরা করিবে, ইহাই বিধির বিধান,—যেমন বিধির বিধান বা প্রাকৃতিক নিয়ম হইল যে, গরু হাল বহিবে, ঘোড়া গাড়ী টানিবে, গাধাতে মোট বহিবে।

যখন ইংলণ্ডকে পরাজিত করিয়া জর্জ্জ ওয়াশিংটন আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলিকে এক করিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিলেন, তখন সেই যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার কি আদর্শ হইবে, তাহা আমেরিকার তিনজন শ্রেষ্ঠলোক পরামর্শ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন—সেই তিনজনের নাম হইল, জর্জ্জ ওয়াশিংটন, টমাস্ জেফারসন্ এবং আলেকজাণ্ডার হামিল্‌টন।

এই তিনটী স্বাধীনতার পূজারীর তৈরী সেই শাসন-তন্ত্রের খসড়া মানব-চিন্তার ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া আছে। সেই শাসন-তন্ত্রের মূল কথা হইল, "প্রত্যেক মানুষ স্বাধীন এবং সমান···প্রত্যেক মানুষের কতকগুলি জন্মগত অধিকার আছে, যাহা অন্য কোন মানুষ কাড়িয়া লইতে পারিবে না বা হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।"

এই আদর্শ স্বীকার করিলে, কেহ আর কোন মানুষকে ক্রীতদাস-রূপে দেখিতে পারে না এবং যে-রাষ্ট্র এই আদর্শ-বাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার মধ্যে কেহ ক্রীতদাস থাকিতে পারে না। সেই স্বাধীনতার বাণী ঘোষণার সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর-অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি তাহাদের এলাকা হইতে ক্রীতদাস-প্রথা তুলিয়া দিল কিন্তু দক্ষিণ-রাষ্ট্রগুলি পারিল না। তাহার কারণ, বরাবরই দক্ষিণের লোকেরাই ক্রীতদাস বেশী পুষিত। উত্তর-অঞ্চলের লোকদের অপেক্ষা তাহাদের ক্রীতদাসদের বেশী

দরকার ছিল। কারণ, উত্তর-অঞ্চলের আব্‌হাওয়া ছিল ঠাণ্ডা, সেখানে দৈহিক কাজ করিবার জন্য নিগ্রো চাকরের বিশেষ দরকার ছিল না। তাহা ছাড়া, আব্‌হাওয়ার দরুণ, চাষবাসের যে-সব কাজে নিগ্রোদের দরকার হইত, তাহার অধিকাংশই দক্ষিণ-অঞ্চলে হইত।

দক্ষিণ-অঞ্চল অত্যন্ত গরম এবং সেই গরম আব্‌হাওয়ায় শীতপ্রধান দেশের লোক বলিয়া শাদা চামড়াওয়ালা লোকেরা নিচু ধরণের দৈহিক পরিশ্রম বেশী করিতে পারিত না। তাহা ছাড়া, দক্ষিণের প্রধান ঐশ্বর্য্য ছিল, তুলা। এই তুলার চাষে গোড়া হইতে নিগ্রোদের নিযুক্ত করা হইয়া আসিতেছিল, সেইজন্য নিগ্রো মজুর ছাড়া দক্ষিণ-অঞ্চলের লোকদের চলিত না। কাজেই উত্তর-অঞ্চলের লোকেরা ক্রীতদাস-প্রথা উঠাইয়া দিলেও, দক্ষিণ-অঞ্চলের লোকেরা ক্রীতদাস-প্রথা ভুলিতে পারিল না, তাহাদের স্বার্থে আঘাত লাগিল।

তাহারা নিগ্রোদের মানুষ বলিয়া গণ্য করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, নিগ্রোরা ছিল তাহাদের কাছে তাহাদের আসবাব-পত্রের সামিল। তাহাদের লেখাপড়া শিখিবার কোন অধিকার ছিল না···কোন নিগ্রো ছেলে যদি বই ছুঁইত, তাহা হইলে তাহার হাতে অমনি কাটাওয়ালা বেত পড়িত···পালাইয়া বাঁচিবার কোন উপায় ছিল না...পাছে তাহারা লুকাইয়া

পালাইয়া যায়, সেইজন্য তাহাদের মনিবেরা ব্লাড-হাউণ্ড কুকুর পুষিত…সামান্য অপরাধে তাহাদের আধমরা করিয়া প্রহার করা হইত…যেহেতু তাহারা নিগ্রো, তাহাদের মধ্যে বাপের স্নেহ, মায়ের ভালবাসা, স্ত্রীর অনুরাগ, পুত্রের ভক্তি—এসব কিছুই থাকিতে পারিবে না—মনিবের খুসীমত স্ত্রীকে জোর করিয়া বিদেশে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইল—মনিবের খুসীমত মার বুক হইতে ছেলেকে ছিনাইয়া আনিয়া ব্লাড-হাউণ্ড লেলাইয়া দেওয়া হইল—এবং শাসন করিতে গিয়া যদি কোনও শ্বেতাঙ্গ কোনও নিগ্রো দাসকে মারিয়া ফেলেন, তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার ছিল না…

মানুষের প্রতি মানুষের এই ভয়াবহ অত্যাচার নীরবে মানুষ সহিয়া আসিতেছিল। উত্তরের লোকেরা যদিও ক্রীতদাস-প্রথা তুলিয়া দিয়াছিল, পাছে এই ব্যাপার লইয়া দক্ষিণ-অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির সহিত বিবাদ হয়, সেইজন্য তাহারা তাহা লইয়া কোন আলোচনা করিত না। এই বলিয়া তাহারা মনকে সান্ত্বনা দিত যে, কালক্রমে হয়ত ইহা উঠিয়া যাইবে—তাহার জন্য আজ যুক্তরাষ্ট্রের মিলন-সংহতিতে আঘাত করিয়া কি লাভ ?

কিন্তু এই ভাবে ধামাচাপা দিয়া কোন দুষ্ট ক্ষতকে বেশীদিন লুকাইয়া রাখা যায় না। ক্রমশঃ উত্তর-অঞ্চলে একদল

লোক মুখ ফুটিয়া এই প্রথার নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদকে আবেদন করিতে লাগিলেন যে, আইন করিয়া এই বাহুল্য প্রথাকে তুলিয়া দেওয়া হ'ক। তাঁহারা প্রচার করিতে লাগিলেন যে, এই ক্রীতদাস-প্রথা স্বাধীন যুক্ত-রাষ্ট্রের শাসন-তন্ত্রের মূল-নীতির বিরোধী এবং মানবতার পক্ষে জঘন্যতম পাপ। এ পাপ হইতে আমেরিকাকে মুক্ত হইতে হইবে।

এই আন্দোলনের নেতা হইলেন মহাত্মা উইলিয়াম্ লয়েড গ্যারিসন্। শুধু মুখের কথায় কার্য্যসিদ্ধ হইবে না বুঝিয়া তিনি "The Liberator" নামে একখানি কাগজ প্রকাশিত করিলেন। সেই কাগজে দিনের পর দিন এই জঘন্য পাপের বিরুদ্ধে জনমতকে তিনি গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে, নানা বাদানুবাদ ও তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়া সারা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দুইটী দল গড়িয়া উঠিতে লাগিল, একদল যাহারা এই ক্রীতদাস-প্রথা রহিত করিতে চায়, আর অন্যদল হইল তাহারা যাহারা এই প্রথাকে বজায় রাখিতে চায়। অবশ্য দ্বিতীয় দলেই লোকের সংখ্যা বেশী হইল। প্রথম দল যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে অ্যাবলিশ্যানিস্ট্ নামে পরিচিত।

প্রথম প্রথম এই দলে অতি অল্প লোকই যোগদান করিলেন এবং যাঁহারা যোগদান করিলেন, তাঁহারা দেখিলেন যে, এই

ঝগড়া শুধু মুখের কথায় বা কাগজে-কলমে থাকিতেছে না। তাঁহাদের উপর নির্য্যাতন সুরু হইল।

এই নির্য্যাতনের ফলে গ্যারিসন্ আরো তীব্রভাবে এই প্রথাকে আক্রমণ করিয়া চলিলেন। গ্যারিসন্‌কে হত্যা করিবার জন্য দক্ষিণের লোকেরা গোপন দল তৈরী করিল। সেই দলের লোকেরা গ্যারিসনের উপর ভয়াবহ নির্য্যাতনের পালা সুরু করিল।

রাত্রি-বেলায় তাঁহার প্রেসে ঢুকিয়া তাহারা প্রেস ভাঙ্গিয়া দিয়া যায়, কাগজ-পত্র পোড়াইয়া দেয়, সমস্ত টাইপ লইয়া নদীর জলে ফেলিয়া দেয়। লিন্‌কন্ তখন দূর হইতে এই সব ব্যাপার দেখিতেছিলেন এবং শুনিতেছিলেন। ক্রমশঃ গ্যারিসনের উপর অত্যাচারের মাত্রা আরো তীব্র হইল। পথে বাহির হইলে, আড়াল হইতে লোকে তাঁহাকে ঢিল ছুড়িয়া আহত করে, দল বাঁধিয়া লোক আসিয়া তাঁহার গায়ে থু-থু দিয়া যায়। কিন্তু কিছুতেই, কোন ভয়েই তাঁহার কলম থামিল না। শেষকালে মার-ধোর এবং হত্যা সুরু হইল।

নীরবে আদর্শের জন্য যিনি সকল অত্যাচার সহ্য করেন, বহুদিন তাঁহাকে আর একাকী থাকিতে হয় না। গ্যারিসনের সেই নীরব বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া একদল লোক তাঁহার সহিত সেই দুঃখবরণ করিয়া লইতে সম্মত হইল। দেখিতে-

দেখিতে তাঁহার দলের লোকেরা প্রকাশ্যভাবে আন্দোলন সুরু করিল। বিপক্ষ-দলেরা নির্ম্মম আক্রমণ সুরু করিল। গ্যারিসনের শিষ্যরা প্রকাশ্য রাজপথে নিহত হইতে লাগিলেন। হাত-পা বাঁধিয়া, মুখে কাপড় গুঁজিয়া নদীর জলে তাঁহাদের ডুবাইয়া দেওয়া হইল। মানুষ চিরকাল ভাবিয়াছে, এই করিয়া সত্যকে চাপিয়া রাখা যায়; কিন্তু সত্য চিরকাল এমনি নির্য্যাতন সহিয়া আবার মেঘমুক্ত সূর্য্যের মত জাগিয়া উঠিয়াছে!

লিন্‌কন্ হঠাৎ কোন মত গ্রহণ বা বর্জ্জন করিতে পারিতেন না। ছেলেবেলা হইতে যাহা কিছু তিনি মনে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট সময় ব্যয় করিতে হইয়াছে; কিন্তু একবার মনে যে জিনিস আসিয়া প্রবেশ করিল, চিরকালের মত তাহা সেখানে রহিয়া গেল।

দূর হইতে লিন্‌কন্ এই ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলেন। লক্ষ্য করিতে-করিতে তাঁহার অন্তরে তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, এই জঘন্য পাপ দূর না করিলে, সমগ্র যুক্ত-রাষ্ট্রের ইতিহাসের ধারা মিথ্যা হইয়া যাইবে। তিনি কোনও দলে না মিলিয়া প্রকাশ্যভাবে নিজে এই জঘন্য প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

এবারে লিন্‌কন্ স্প্রিংফিল্ড্-এ আসিয়া পুরো-দস্তুর উকীল হইয়া বসিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, আর্থিক দিক হইতে

যদি তিনি নিজের পায়ে নিজে না দাঁড়াইতে পারেন, তাহা হইলে রাজনীতি বা দেশের কাজে তিনি নিজের স্থান করিয়া লইতে পারিবেন না। তাই রাজনীতিতে পূরোদস্তুর যোগ দিবার আগে, তিনি অর্থোপার্জ্জনের দিকে বেশী ঝোঁক দিলেন, এবং কি করিয়া ভাল উকীল হওয়া যায়, তাহা নিজে চেষ্টা করিয়া শিখিতে লাগিলেন।

যেমন ছিল তাঁহার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা, তেমনি ছিল তাঁহার শিখিবার আগ্রহ। জীবনের সামান্যতম কাজেও তিনি কখনও ফাঁকি দেন নাই। কি করিয়া জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হয়, লিন্‌কনের জীবন হইল তাহার একটী শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

প্রথমে তিনি চিন্তা করিয়া বাহির করিলেন, কি-কি গুণ থাকিলে ভাল উকীল হওয়া যায়। তিনি দেখিলেন যে, ভাল উকীল হইতে হইলে, প্রথমে, নিজে যাহা ভাবিতেছেন, তাহা অন্যকে বুঝাইবার সময়, যেন কোন ত্রুটী না থাকে। ঠিক একটীর পর একটী কথা সাজাইয়া, ধাপের পর ধাপ চিন্তাগুলিকে যদি সাজান যায়, তাহা হইলে তিনি যাহা বলিতে যাইতেছেন, তাহা অনায়াসেই অপরকে বুঝাইতে পারা যায়। ইহার জন্য মনের যে গড়ন দরকার, তাহা একমাত্র অঙ্কশাস্ত্র যদি ভালভাবে অনুশীলন করা যায়, তাহা হইলে সম্ভব হয়।

এইভাবে সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া তিনি ছাত্রের ন্যায়

অঙ্কশাস্ত্র অনুশীলন করিতে লাগিলেন। একলা ঘরে বিভিন্ন বিষয়ে নিজে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন—বক্তৃতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সব লেখাগুলি নিজেও সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। সমালোচনা করিয়া দেখিলেন যে, তাহার মধ্যে প্রায়ই চিন্তার অস্পষ্টতা রহিয়াছে। এক কথা হইতে আর এক কথায় আসার মধ্যে যেন অনেক কথা পড়িয়া গিয়াছে, তাহার জন্য সমস্ত বক্তব্যটাই অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। চিন্তাগুলি ঠিক স্বাভাবিক নিয়মে ধাপের পর ধাপ অগ্রসর হয় নাই। কি করিলে মন ঠিক সেই ভাবে ধাপের পর ধাপ চিন্তা করিতে পারে?

তিনি খুঁজিয়া দেখিলেন, ইউক্লিডের জ্যামিতি ঠিক সেই ভাবে গঠিত। তিনি সমগ্র ইউক্লিড কষিতে আরম্ভ করিলেন।

ইউক্লিড্ একটা কথা বার-বার ব্যবহার করিয়াছেন, সে কথাটা হইল Demonstrate…ইউক্লিডের প্রত্যেক সমস্যা-পূরণের শেষে লেখা থাকে, Q. E. D…

এই শেষের D হইল Demonstrated-এর অপভ্রংশ… অর্থাৎ যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছিলাম, তাহা এইভাবে বোঝান হইল…উকীলের কাজ হইল, এই বুঝান…Demonstrate করা…তাই তিনি ইউক্লিডের কাছে শিখিলেন কি করিয়া হিসাব করিয়া বোঝান যাইতে পারে।

তাঁহার আত্মচরিতে এই সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, "I wanted to know what was the meaning of the word 'demonstrate'. Euclid taught me what demonstration was."

এইভাবে খুব কম মানুষকেই দেখা গিয়াছে, বাহিরের কোন সাহায্য না লইয়া নিজেকে এতখানি বৃহৎভাবে গড়িয়া তুলিতে। সেই দিক দিয়া এত বড় দৃষ্টান্ত ছাত্রদের নিকট আর কোন জীবনীতে পাওয়া যায় না।

লিন্কন্ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইতিহাসের অন্য মহাপুরুষদের সহিত তাঁহার সেইখানে একটা মস্ত-বড় পার্থক্য। কিন্তু তাঁহার জীবন হইতে আমরা জানিতে পারি যে, চেষ্টা, নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায় দ্বারা জীবনে যে কোন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করা যায়, তাহার জন্য বিশেষ প্রতিভার কোন প্রয়োজন হয় না।

নিজের এই অসাধারণ চেষ্টার ফলে লিন্কন্ দুই বৎসরের মধ্যে স্প্রিংফিল্ডের যে কোন আইন-ব্যবসায়ীর সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু অন্য সব আইন-ব্যবসায়ীর মত তিনি শুধু বৃহৎ অর্থ উপায়ের পন্থা-স্বরূপ আইনের ব্যবসায় গ্রহণ করেন নাই।

ছেলেবেলা হইতে তাঁহার মধ্যে যে সাধুতা ছিল, যে পরোপকার-প্রবৃত্তি ছিল, আইন-ব্যবসায়ে যোগদান করিয়া

তিনি দেখিলেন তাহার বিষম পরীক্ষা তাঁহাকে দিতে হইবে। তিনি দেখিলেন, কথার মার-প্যাঁচে এখানে চোরকে সাধু করা যায়, সাধুকে চোর করা যায়। তিনি কিন্তু সে পথ অবলম্বন করিলেন না। যে কেস্ তিনি বুঝিতেন যে, আইনের সাহায্যে অন্যায়ই জয়ী হইতে চায়, সে কেস্ তিনি গ্রহণ করিতেন না। বুঝিতে না পারিয়া গ্রহণ করিলেও, কিছুদূর অগ্রসর হইয়া যখন বুঝিতে পারিতেন যে, তিনি যাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, সেই ব্যক্তিই আসল দোষী, তিনি তেমন জোর করিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিতেন না।

মস্তিষ্ককে তিনি কোনও দিন অন্তরের উপর জয়ী হইতে দেন নাই। একবার এক ভদ্রলোক তাঁহার এক বিধবা আত্মীয়ের বিরুদ্ধে ছয়শ' ডলারের নালিশ করেন। লিন্‌কন্ বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার মক্কেল আইনের সুযোগে সেই দরিদ্র বিধবার নিকট হইতে ছয়শ' ডলার আদায় করিতে চান। তিনি তাঁহাকে কেস্ ফেরৎ দিয়া স্পষ্ট তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, আপনার যদি ছয়শ' ডলারের প্রয়োজন হইয়া থাকে, বৃহৎ পৃথিবী পড়িয়া রহিয়াছে, অন্য সৎ উপায়ে তাহা অর্জ্জন করুন।

তাঁহার চরিত্রের এই মহৎ দিক্ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সকলেই জানিত, আড়ম্বরহীন সেই লোকটী তাহাদের

সকলের বন্ধু। নিতান্ত অপরিচিত লোকও তাঁহার নিকট আসিয়া তাহার মনের সুখ-দুঃখের কথা তাঁহাকে জানাইত।

প্রত্যেককে বন্ধুভাবে তিনি গ্রহণ করিতেন। তাঁহার অন্তরের সেই উষ্ণতা এক চিত্ত হইতে আর-এক চিত্ত জয় করিয়া চলিল। জীবনে যাহাদের সংস্পর্শে আসিতেন, তিনি তাহাদেরই একজন হইয়া থাকিতেন। কখনও কোন মানুষ কখন অনুভব করে নাই যে তিনি কোন উচ্চস্তর হইতে কথা বলিতেছেন। জীবনে যেদিন তাঁহার অন্ন জুটিত না সেদিন তিনি যেমন ছিলেন, যেদিন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ছিলেন সেদিনও ঠিক তেমনি ছিলেন। তিনি একদিন যে দরিদ্র ছিলেন, সে কথা কখনও ভুলিতেন না।

যখন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি, তখন এক দিন তাঁহার বন্ধুদের নিকট তিনি এক স্বপ্নের গল্প বলেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতিরূপে এক বিরাট সভার মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার আসনের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। এমন সময় তিনি যেন শুনিতে পাইলেন, পাশের একজন বিধবা মহিলা তাঁহার পাশে এক ভদ্রলোককে বলিতেছেন, এই মিঃ লিন্‌কন্ দেখ্‌ছি অতি সাধারণ লোক!

তিনি বলিয়াছিলেন, আমি স্বপ্নে তাহা শুনিয়া মনে-মনে বলিলাম, সত্যই তাহা...সত্যই আমি অতি সাধারণ লোক...

তবে ভগবান্, যিনি সাধারণ এবং অসাধারণ সকল মানুষকেই সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সাধারণ লোকদেরই বেশী ভালবাসেন; নহিলে এত বেশী করিয়া তাহাদেরই সৃজন করিতেন না।

লিন্‌কনের চরিত্রের অসাধারণত্বের মূল উৎস হইতেছে, তিনি সাধারণ মানুষের নিকট হইতে কখনও দূরে সরিয়া যান নাই,---সাধারণ মানুষের মন ও মনস্তত্ত্ব তিনি তাঁহার অন্তরের স্বাভাবিক সহানুভূতি দিয়া সহজেই বুঝিতে পারিতেন; তাই জগতের নিম্নতম স্তর হইতে তিনি জগতের বৃহত্তম জাতির একমাত্র পরিচালক হইতে পারিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ যুক্তরাষ্ট্রে উত্তর আর দক্ষিণের মধ্যে বিবাদ স্পষ্ট এবং তীব্র হইয়া উঠিতেছিল। একদা উত্তর-অঞ্চলের লোকেরা দরিদ্র ছিল, তাহাদের ভূমি ছিল অনুর্ব্বর, তাহাদের চাষবাসের লোকজন ও আয়োজন তেমন ছিল না...অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত য়ুরোপীয়ান ঔপনিবেশিকরা কোন রকমে মাটী আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিত।

দক্ষিণে তখন যাহারা বসবাস স্থাপন করিয়াছিল, মাটীর গুণে এবং নিগ্রোদের পরিশ্রমের ফলে তাহারা প্রায় সকলেই ধনী ছিল। কিন্তু অর্থে অলসতা আসে। নিগ্রোদের পরিশ্রমে আজ তূলার পয়সায় ধনী হইয়া দক্ষিণের লোকেরা

শোন,···কাল তোমাকে মরতে হবে না।

[পৃঃ—৭৯

ক্রমশ অলস ও বিলাসী হইয়া পড়িতে লাগিল। বিলাসিতা-বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে অন্তর তাহাদের ক্রমশ দরিদ্র হইতে লাগিল।

ওদিকে উত্তরের লোক স্বভাবতই পরিশ্রমী। তাহার ফলে তাহাদের মানসিক বৃত্তিগুলিও ক্রমশ উন্নত হইয়া উঠিল।

সাধারণ ব্যক্তিগত জীবনে দেখা যায়, এক বংশ, পরের পরিশ্রমে পৈতৃক সম্পত্তি ভাঙ্গাইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে ভালবাসে, আর-এক বংশের ছেলেরা নিজেদের পরিশ্রমে নিজেরা উন্নত হইয়া উঠিতেছে। এই দুই বংশের শিক্ষা, দীক্ষা ও শালীনতার মধ্যে ক্রমশই একটা স্পষ্ট পার্থক্য ফুটিয়া উঠে। উত্তর ও দক্ষিণের অধিবাসীদের মধ্যেও সেইরকম একটা পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

উত্তরের লোকেরা দেখিতে-দেখিতে নিজেদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-সমস্যা দূর করিবার জন্য গ্রামে-গ্রামে শহরে-শহরে স্কুল গড়িয়া তুলিল...সেই সমস্ত স্কুলে পড়িয়া দীন-দরিদ্র ঘরের ছেলেরাও শিক্ষার গুণে সমাজের উচ্চস্তরে আগাইয়া আসিল... নূতন-নূতন যন্ত্রপাতি তাহারা করিতে শিখিল এবং তাহার ফলে অর্থ-উপার্জ্জনের নতুন-নতুন পন্থাও আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। এই সব কারণে উত্তর-অঞ্চলের লোকদের মধ্যে স্বভাবতই একটা সুশিক্ষাসম্মত উদার মনোভাব জাগিয়া উঠিল।

ওধারে দক্ষিণ-অঞ্চলে জীবন ঠিক বিপরীত ধারায় চলিতে-

ছিল। রাজনীতি বা সমাজ বা দেশ-শাসনে, সর্ব্বত্রই সেখানে কতকগুলি ধনী বংশের লোকদের হাতে সকল ক্ষমতা গিয়া পড়িয়াছিল। সাধারণ লোকেরা দেশের চলমান জীবনের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা কিছু কাজ, তাহা ক্রীতদাসেরা করিত।

পাছে শিক্ষার আবহাওয়ায় পড়িয়া ক্রীতদাসদের মনের মধ্যে ভাবান্তর আসিয়া পড়ে, সেইজন্য স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার দিকে তাহাদের কোনও আগ্রহ ছিল না। এইভাবে এক অলস-বিলাসিতার মধ্যে দক্ষিণ ক্রমশঃ হীনবুদ্ধি হইয়া আসিতেছিল; এবং হীনবুদ্ধি লোকেরা যেমন অপরকে ঈর্ষ্যা করে, দক্ষিণের লোকেরা তেমনি উত্তর-অঞ্চলের লোকদের ঘৃণা করিত। উত্তর-অঞ্চলের লোকেরাও দক্ষিণের লোকদের হেয় জ্ঞান করিত।

মাঝে-মাঝে ক্রীতদাসরা দক্ষিণ হইতে পলাইয়া উত্তর-অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিত। তখন সেই পলাতক ক্রীতদাসকে লইয়া উত্তর এবং দক্ষিণের লোকদের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমা বাঁধিয়া যাইত। এইভাবে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে, ভিতর ও বাহিরের দিক হইতে এক ঘোরতর মনোমালিন্যের আগুন ধীরে-ধীরে জ্বলিয়া উঠিতেছিল। তাহা দূর করিবার জন্য এই উভয় লোকদের প্রতিনিধিদের লইয়া একটী আপোষ-মীমাংসা হয়। সেই মীমাংসার ফলে যুক্ত-রাষ্ট্রের ম্যাপে ৩৬° ৩০′ মিনিটের

কাছাকাছি একটা লাইন টানা হইল। এই লাইনটার নাম হইল ম্যাসন এণ্ড্ ডিক্‌সন্ লাইন। স্থির হইল, এই লাইনটার উত্তরে ক্রীতদাস-প্রথা থাকিতে পারিবে না।

এই সময় লিন্‌কনের আইন-ব্যবসায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী ডগলাস্ মাথা তুলিয়া উঠিলেন। ডগ্‌লাসের সামনে একটা মাত্র আদর্শ ছিল, কি করিয়া নিজেকে যুক্ত-রাষ্ট্রের সভাপতি করা যায়। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সেজন্য দক্ষিণ-অঞ্চলের লোকদের তাঁহার হাতে রাখিতে হইবে, এবং দক্ষিণ-অঞ্চলের লোকদের হাতে রাখিতে হইলে, ক্রীতদাস-প্রথা সম্বন্ধে আইনের কড়াকড়ি তুলিয়া দিতে হইবে। সেই জন্য তিনি প্রচার করিতে লাগিলেন যে, ক্রীতদাস রাখা বা না-রাখা প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজের ঘরের সমস্যা, তাহার উপর কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কোন হাত থাকিতে পারিবে না।

সেই সময় যুক্ত-রাষ্ট্রের মধ্যে আরো দুইটী নতুন রাষ্ট্র সংযুক্ত হয়, নব্রাস্‌কা এবং ক্যান্‌সাস্। এই দুই প্রদেশই ম্যাসন-লাইনের উত্তরে, সুতরাং চুক্তি অনুযায়ী এই দুই নতুন রাষ্ট্রে ক্রীতদাস-প্রথা রহিত হওয়া উচিত। তাহা হইলে কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদে ক্রীতদাস-প্রথা-রহিত রাষ্ট্রের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। তাই দক্ষিণের লোকেরা ডগলাসের নেতৃত্বে এক আন্দোলন সুরু করিলেন যে, এই দুই অঞ্চলে ক্রীতদাস-প্রথা

রহিত হইবে কি থাকিবে, তাহা সেই অঞ্চলের লোকেরাই নির্দ্ধারিত করিবে। এই মর্ম্মে ডগলাস্ কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদে এক বিল আনিলেন। তাঁহার দলের নাম ছিল, ডেমোক্রাট। লিন্‌কন্‌ও তখন প্রাদেশিক শাসন-পরিষদে মনোনীত হইয়া যুক্ত-রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদে, কংগ্রেস যাহার নাম, তাহার সভ্য হইয়াছেন। ডগলাসের এই বিলের বিরুদ্ধে লিন্‌কন্ রিপাব্‌লিকান্ দলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া গড়িয়া তুলিলেন।

ডগলাস্ জানিতেন যে, ক্যানসাসের লোকদের ভোটের উপর ছাড়িয়া দিলেও, ক্যানসাসের লোকেরা ক্রীতদাস-প্রথার বিরুদ্ধেই ভোট দিবে এবং সেখানকার জনসংখ্যা তখন খুব কম; কিন্তু তিনি অন্য উপায় স্থির করিয়াছিলেন।

ক্যান্‌সাসের পাশেই হইল মিসৌরী ষ্টেট। মিসৌরী ষ্টেট্ দক্ষিণ-অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত এবং সেখানে ক্রীতদাস-প্রথা চলিয়া আসিতেছিল। যখন ভোটের সময় আসিল তখন দেখা গেল যে, মিসৌরী ষ্টেট হইতে অসংখ্য সশস্ত্র লোক ক্যান্‌সাস্ ষ্টেটে গোপনে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। যাহারা ক্রীতদাস-প্রথার বিরুদ্ধে ভোট দিতে চাহিল, তাহাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ সুরু হইল।

এইভাবে সশস্ত্র আক্রমণের ফলে সে-বছর ভোটে একজন ক্রীতদাস-প্রথার দলের লোক অর্থাৎ ডগলাসের মনোনীত লোকই নির্ব্বাচিত হইলেন। কিন্তু ব্যাপার সেইখানেই শেষ

হইল না। যে বিরাট গৃহ-যুদ্ধের মধ্যে যুক্ত-রাষ্ট্র অচিরকালের মধ্যে লিপ্ত হইয়া পড়ে, সেদিন তাহার সূচনা হইল মাত্র। এই ঘটনার পর হইতে যখনই ইলেক্‌শন্ হয়, তখনই এই ক্রীতদাস-প্রথার ব্যাপার লইয়া দুই দলে সশস্ত্র মারামারি সুরু হইতে লাগিল।

লিনকন্ এই জঘন্য প্রথার বিরুদ্ধে জনমতকে গঠন করিবার জন্য জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বক্তৃতা দিতে-দিতে তাঁহার ভিতর এমন আবেগ আসিয়া যাইত যে, রিপোর্টাররা তাঁহার কথা টুকিতে সময় পাইত না; কেহ বা তাঁহার বক্তৃতায় এত মুগ্ধ হইয়া যাইত যে, লিখিতে ভুলিয়া যাইত। তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতায় ক্রমশ উত্তর-অঞ্চলের লোক সচেতন হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই সময় যুক্ত-রাষ্ট্রের সভাপতি-নির্ব্বাচনের সময় আসিল; কিন্তু তখনও লিন্‌কনের নাম ও খ্যাতি যুক্ত-রাষ্ট্রের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে নাই। নির্ব্বাচনের ফলে ডেমোক্রাট দলের মিঃ বুকানন্ নামে একজন লোক সভাপতি হইলেন। কিন্তু লিন্‌কন্ তাহাতে নিরুৎসাহ হইলেন না। তিনি রিপাব্‌লিকান্ দলকে আরো বলশালী ও সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেলেন।

সারা দেশময় ক্রমশ এই ব্যাপার লইয়া ছোট-বড় নানা রকমের জঘন্য ব্যাপার নিত্য ঘটিতে লাগিল। ক্রীতদাস-প্রথার বিরোধী লোকেরা প্রকাশ্য ভাবে লাঞ্ছিত এবং গুপ্তভাবে আহত হইতে লাগিলেন। এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে ড্রেড্ স্কট্ নামে এক নিগ্রোর মামলা লইয়া সারা দেশময় এক বিপুল সাড়া পড়িয়া গেল।

ড্রেড্ স্কট্ যুক্ত-রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আদালতে নিজের স্বাধীনতা দাবী করিয়া এক মামলা আনে। মামলায় তাহার বক্তব্য ছিল যে, তাহার মনিব তাহাকে সঙ্গে করিয়া উত্তর-অঞ্চলে লইয়া আসিয়াছেন। উত্তর-অঞ্চলের বাসিন্দা হিসাবে সে আর এখন ক্রীতদাস নয়।

প্রধান বিচারক ছিলেন মিঃ ট্যানে। তিনি ক্রীতদাস-প্রথার একজন ঘোরতর সমর্থক ছিলেন। তিনি শুধু ড্রেড্ স্কটের বিরুদ্ধে যে রায় দিলেন তাহা নয়, তিনি তাঁহার রায়ে জানাইলেন যে, যেহেতু আইনত একজন নিগ্রো হইল তাহার মনিবের সম্পত্তি-বিশেষ, কাজেই মানুষরূপে যুক্ত-রাষ্ট্রের কোন আদালতে কোন মোকদ্দমা আনিবার তাহার অধিকার নাই; এবং নিগ্রোর এমন কোন অধিকার থাকিতে পারে না, যে অধিকার শ্বেতাঙ্গ লোক সম্মান করিতে বাধ্য।

বিচারপতি ট্যানের এই রায় শুনিয়া দক্ষিণ-অঞ্চল উল্লসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু এই অদ্ভুত রায় লিন্‌কনের মনে দাবাগ্নি জ্বালাইয়া তুলিল। যে-স্বাধীনতার চুক্তি-পত্রের উপর যুক্ত-রাষ্ট্রের ভিত্তি, সেই চুক্তির অপমানকারী এত বড় কথা আর কি হইতে পারে? প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকারকে স্বীকার করিয়া যে দেশের জন্ম, সেই দেশে মানুষ মানুষকে মনে করিবে, শুধু নির্জীব সম্পত্তি মাত্র?

লিন্‌কন্ ট্যানের রায়ের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই সময় এক জায়গায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "যেহেতু প্রত্যেক নিগ্রো তাহার নিজের পরিশ্রমে তাহার অন্ন উপার্জ্জন করে, আমার মনে হয়, মানুষ হিসাবে তাহার অধিকার এবং দাবী, আমাদের অনেকের চেয়ে ঢের বেশী।"

লিন্‌কনের এই সব উক্তি আমেরিকার ইতিহাসের পাতাকে পবিত্র ও চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

যখন এইভাবে সারা দেশময় আন্দোলন তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতেছিল, সেই সময়, ইলিনয়স্ ষ্টেট হইতে ডগলাস্ এবং লিন্‌কন্ প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়াইলেন। এই ভোটের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিন্‌কনের বন্ধুরা পরিচয় পাইলেন যে, লিন্‌কনের হৃদয় কি অসাধারণ সাধুতায় বিমণ্ডিত!

ইলিনয়স্ ষ্টেট হইল, ক্রীতদাস-প্রথার বিরোধী। সেখানে কোনও লোক ক্রীতদাস-প্রথার স্বপক্ষে মত দিয়া ভোট পাইতে পারে না। নির্ব্বাচনের আগে লিন্‌কন্ স্থির করিলেন যে, প্রকাশ্য সভায় তিনি ডগলাস্‌কে একটী প্রশ্ন করিবেন,—যদি কোন ষ্টেট্ চায় যে, সে ক্রীতদাস-প্রথা তুলিয়া দিবে, সে আইনত তাহা পারে কি? যদি ডগলাস্ বলে, না,—তাহা হইলে সে ইলিনয়সের লোকের ভোট হইতে বঞ্চিত হয়। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহাকে বলিতে হইবে,— হাঁ, পারে!

তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহার বন্ধুরা বলিয়া উঠিলেন,— তাহাতে আপনার কি লাভ? তাহাতে তো ডগলাস্ নির্ব্বাচিত হইয়া যাইবেন, আপনি পরাজিত হইবেন!

লিন্‌কন্ উত্তরে বলিয়াছিলেন, আমি আমার কথা ভাবিতেছি না; এবং তোমাদের মত আজকার কথাও ভাবিতেছি না। আজ যদি সে "হাঁ" বলে, সে নিশ্চয়ই নির্ব্বাচিত হইবে। কিন্তু দুই বছর পরে যখন সে সভাপতির পদের জন্য দাঁড়াইবে, তখন আজিকার তাহার এই উত্তর দক্ষিণ-অঞ্চলের ভোট হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবে। ডগলাস্ যদি সভাপতি হয়, তাহা হইলে অচিরকালের মধ্যে যুক্ত-রাষ্ট্র হইতে আর ক্রীতদাস-প্রথাকে উচ্ছেদ করা যাইবে না!

লিন্‌কনের এই বুদ্ধি এবং আদর্শ নিষ্ঠা দেখিয়া বন্ধুরা মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

লিন্‌কনের অনুমান ঠিক হইয়াছিল। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে ডগলাসকে "হাঁ" বলিতেই হইল—নতুবা ইলিনয়সের ভোট তিনি পান না। লিন্‌কন্‌ হারিয়া গেলেন। ডগলাস জয়ী হইয়া সিনেটে প্রবেশ করিলেন!

কিন্তু ডগলাসের কাণ্ড দেখিয়া দক্ষিণ-অঞ্চলের লোকেরা ক্ষেপিয়া গেল। পরাজিত হইয়া লিন্‌কন্‌ বিমর্ষ না হইয়া আরো সুখী হইলেন! তিনি নিজের ষ্টেট ছাড়িয়া এবার অন্যান্য ষ্টেটে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার বক্তৃতার ভাষার মধ্যে তাঁহার অন্তরের নিষ্ঠা ও সত্যবাদিতা এমন ভাবে ফুটিয়া উঠিল যে, তাহা লোকের অন্তর স্পর্শ না করিয়া থাকিতে পারিল না। দেখিতে-দেখিতে প্রত্যেক ষ্টেটের রিপাব্‌লিকান দলের পক্ষ হইতে তাঁহার নিকট নিমন্ত্রণ আসিতে আরম্ভ করিল।

নিউইয়র্ক শহরে তখন রিপাব্‌লিকান্‌ দলের সব চেয়ে বড় আড্ডা ছিল। উত্তর-অঞ্চলের সমস্ত বিশিষ্ট লোকেরা নিউ-ইয়র্ক শহরে রিপাব্‌লিকান্‌ দলের বার্ষিক সভায় সমবেত হইয়াছেন। সেখানে প্রবীণ বক্তা-রূপে লিন্‌কনের নিমন্ত্রণ আসিল।

সেই সভায় তিনি যে বক্তৃতা দিলেন, তাহার ফলে উত্তর-অঞ্চলের সমস্ত বিশিষ্ট লোক বুঝিলেন যে, এই উদীয়মান আইন-ব্যবসায়ীর মধ্যে তাহাদের দলের নেতা হইবার লক্ষণ সমূহভাবে রহিয়াছে।

এইভাবে দেখিতে-দেখিতে আবার সভাপতি-নির্ব্বাচনের সময় আসিয়া গেল। দক্ষিণের লোকেরা এতদিন ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল যে ডগলাসকেই তাহারা মনোনীত করিবে; কিন্তু ইলিনয়সের বক্তৃতার ফলে তাহারা ডগলাসকে ছাড়িয়া তাহাদের ডেমোক্রাটিক দলের নেতারূপে জেফারসন্‌ ডেভিস্‌ নামে এক ধনী লোককে মনোনীত করিল। উত্তর-অঞ্চলের রিপাব্‌লিকান্‌ দল, লিন্‌কন্‌কে মনোনীত করিল।

যখন এই সংবাদ লিন্‌কনের নিকট উপস্থিত হইল, তখন তিনি তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিতেছিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া তিনি শুধু বলিলেন, আমার অপেক্ষা যোগ্য লোককে তাঁহারা মনোনীত করিলে পারিতেন! তবে আমাকে যখন তাঁহারা মনোনীত করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের এই বিশ্বাসের উপযুক্ত হইবার চেষ্টা করিব।

নির্ব্বাচনে লিন্‌কন্‌ জয়ী হইলেন। ক্যানটাকীর অরণ্য-পথ হইতে যে নামহীন বালক জগতের রাজ-পথে বাহির

হইয়াছিল, ইতিহাসের সূর্য্যালোক-উদ্ভাসিত মধ্যাহ্নে সে রাজটীকা লইয়া সকলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাঁহার জীবনের আসল সংগ্রাম তখন স্বরু হইল মাত্র।

যুক্ত-রাষ্ট্রের জীবনের সব চেয়ে সঙ্কটময় কালে লিন্‌কন্‌ তাহার কর্ণধার হইলেন। তাঁহার আগে প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, বুকানন্‌। বুকাননের নিজের কোনও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল না; নিজে উদ্যোগী হইয়া কোন কিছু করিবার সাহস বা বুদ্ধি তাঁহার ছিল না। তিনি ছিলেন দক্ষিণ-অঞ্চলের ধনী লোকদের হাতের পুতুল। তাঁহার পরিত্যক্ত স্থানে যখন লিন্‌কন্‌ আসিয়া বসিলেন, তখন দক্ষিণের লোকেরা বুঝিল, আর তাহাদের ইচ্ছামত রাষ্ট্রযন্ত্র-চালনা সম্ভব হইবে না।

সকলের চেয়ে বেশী বিপদ হইল লিন্‌কনের নিজের। দক্ষিণের লোকেরা তাঁহাকে শত্রু বলিয়া জানে। উত্তরেও এক শ্রেণী লোক, ক্রীতদাস-প্রথা লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতে চায় না···তাহারা সমস্ত সমস্যা ধামা-চাপা দিয়া রাখিতে চায়; কিন্তু লিন্‌কন্‌ দেখিলেন, আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলে না। সময় আসিয়াছে; এখন যাহা ভাল তাহাকে কার্য্যে পরিণত করা, যাহা মন্দ তাহাকে উচ্ছেদ করা চাই। চুপ করিয়া বসিয়া থাকা মানে নীরবে অপঘাতের দিকে অগ্রসর হইয়া চলা।

লিন্‌কন্ ছিলেন দেশ-প্রেমিক। তিনি অন্তরের অন্তর হইতে ভালবাসিতেন যুক্ত-রাষ্ট্রকে, যে যুক্ত-রাষ্ট্র উত্তর এবং দক্ষিণ দুই লইয়াই গঠিত।

যদি উত্তর এবং দক্ষিণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাহার অপেক্ষা দুর্দ্দৈব কিছু হইতে পারে না। যদি জীবনও যায়, তবুও যুক্ত-রাষ্ট্রকে দুই ভাগে বিভক্ত হইতে তিনি দিতে পারেন না, উত্তর-অঞ্চলের এক শ্রেণীর লোক এই সমস্যা লইয়া কোন আলোচনাও করিতে চাহে না। প্রেসিডেন্টের আসনে বসিয়া লিন্‌কন্ দেখিলেন, তিনি একা।

স্প্রিংফিলডের বাসা তুলিয়া ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্টের শ্বেতপ্রাসাদে আসিতে প্রায় তিন মাস সময় লাগিয়া গেল। এই তিন মাসের মধ্যে লিন্‌কন্ ভবিষ্যৎ কর্ম্ম-জীবনের জন্য নিজেকে তৈরী করিতে লাগিলেন...পড়াশোনা করিয়া যাহা জানা অসম্পূর্ণ ছিল, তাহা পড়িয়া শেষ করিলেন...তিনি জানিতেন যে, প্রেসিডেন্ট হওয়া শুধু যে গৌরব তাহা নয়, তাহার যে বিরাট দায়িত্ব, সে দায়িত্বের উপযোগী তাঁহাকে হইতে হইবে। প্রেসিডেন্টের আসনে বসিয়া তিনি শুধু তাঁহার নিজের গৌরবের সুখে অলস জীবন যাপন করিতে চাহেন না।

এই তিন মাসের মধ্যে কিন্তু ভাগ্য অন্যদিক হইতে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের পন্থা গড়িয়া তুলিতেছিল। দক্ষিণের লোকেরা

বিপদ আশঙ্কা করিয়া আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে চাহিল না। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর দক্ষিণ-ক্যারোলিনার লোকে সমবেত হইয়া প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। তাহারা আর যুক্ত-রাষ্ট্রের মধ্যে থাকিতে চাহে না।

সেই মর্ম্মে চারিদিকে প্রাচীর-পত্র পড়িয়া গেল। দক্ষিণ-ক্যারোলিনার দেখাদেখি সমস্ত দক্ষিণে একটা চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিল। দেখিতে-দেখিতে, মিসৌরী, আলাবাথা, ফ্রোরিডা, জর্জ্জিয়া, লুইসিয়ানা এবং টেক্‌সাস্—দক্ষিণের প্রত্যেক রাষ্ট্র একে-একে ঘোষণা করিল যে, তাহারা যুক্ত-রাষ্ট্রের মধ্যে আর থাকিতে চাহে না, তাহারা নিজেরা মিলিত হইয়া আর-এক নূতন রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবে ; তাহারা উত্তরের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের শাসন আর মানিতে চাহে না...এমন কি, তাহাদের সভাপতি পর্য্যন্ত তাহারা মনোনীত করিয়া ফেলিল, লিন্‌কনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাজিত জেফারসন্ ডেভিস্ হইলেন, তাঁহাদের মনোনীত প্রেসিডেণ্ট।

লিন্‌কন্ যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই রুদ্র-মূর্ত্তিতে আত্ম-প্রকাশ করিয়া জাগিয়া উঠিল।

প্রত্যেক ষ্টেটে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের একটা করিয়া দুর্গ ছিল। সেই সব দুর্গে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের সৈন্যরা থাকিত। দক্ষিণ-ক্যারোলিনাতে এই রকম দুটী প্রধান দুর্গ ছিল...এই

ক্ষুদ্র দুর্গগুলিতে সৈন্যের সংখ্যা কিন্তু খুব বেশী ছিল না। মেজর এনড়ারসন্ ছিলেন, এই দুই দুর্গের সেনা-নায়ক।

মেজর এনড়ারসন্ দেখিলেন, যদি বিপক্ষ দল আক্রমণ করে, তাহা হইলে দুই দুর্গে যে সৈন্য আছে, তাহা দিয়া দুই দুর্গ রক্ষা করা সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট যদি আরো সৈন্য না পাঠায়, তাহা হইলে দুইটী দুর্গ এক সঙ্গে রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। দুর্গ ছাড়িয়াও দেওয়া যায় না। তাহা হইলে বিপক্ষ-দলের দাবীকে মানিয়া লওয়া হয়। এনড়ারসন নতুন সৈন্যবাহিনীর জন্যে ওয়াশিংটনে আবেদন করিয়া পাঠাইলেন।

ইতিমধ্যে, এই দুই দুর্গে যে সব সৈন্য ছিল, সে সব একত্রে করিয়া তিনি একটী দুর্গে জড় করিলেন, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল দুর্গটী তিনি ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার ছাড়িয়া দেওয়ার সঙ্গে সেই অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল দুর্গটী, ফোর্ট মৌলট্রি দক্ষিণ-ক্যারোলিয়ন সৈন্যদল অধিকার করিয়া বসিল।

এনড়ারসনের আবেদনে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট 'দি ষ্টার অফ্ ওয়েষ্ট' নামক জাহাজে একদল সৈন্য তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য পাঠাইলেন। দক্ষিণ-ক্যারোলিনার সৈন্যদল পথে তাহাকে আক্রমণ করিল এবং 'দি ষ্টার অফ্ ওয়েষ্ট'কে ফিরিয়া যাইতে হইল। জেফারসন্ ডেভিস্, এনড়ারসন্‌কে আক্রমণ করিলেন এবং দ্বিতীয় দুর্গটীও দখল করিয়া লইলেন।

লিন্‌কন্ বুঝিলেন, আর বক্তৃতা এবং আলোচনার সময় নাই। দক্ষিণ-অঞ্চল যখন সমর ঘোষণা করিয়াছে, তখন সমরেই তাহাদের পরাজিত করিয়া, এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। নিজের মনে তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন ; এবং একবার যখন কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গেল, তখন কর্ম্ম-পন্থার মধ্যে আর কোন সন্দেহ বা দ্বিধা থাকিতে পারে না। কয়েক মাস আগে যিনি একজন নিরীহ উকীল ছিলেন মাত্র, তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ সেনাপতির মত সমর-আয়োজনে লিপ্ত হইলেন।

প্রেসিডেণ্টের আসনে বসিয়াই তিনি প্রথম আইন করিলেন, নূতন ৭৫ হাজার সৈন্য গঠন করিতে হইবে। এতদিন উত্তরে যাহারা ভাবিয়াছিল, নির্লিপ্ত হইয়া বসিয়া থাকিলেও চলিবে, দক্ষিণের অযাচিত আক্রমণে এবং নূতন প্রেসিডেণ্টের কর্ম্ম-তৎপরতায় তাহারা তাহাদের জড়তা ত্যাগ করিয়া উঠিল। লিন্‌কন্ প্রাণময়ী ভাষায় উত্তরকে তন্দ্রা হইতে জাগাইয়া তুলিলেন।

আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের ইতিহাসে সব চেয়ে বড় যুদ্ধ সুরু হইয়া গেল। উত্তরের সহিত দক্ষিণের সৈন্যের সংঘর্ষ বাঁধিল, প্রথম ভার্জিনিয়া ষ্টেটে ; কারণ এই ষ্টেটের আধখানা ছিল উত্তরে, আধখানা ছিল দক্ষিণে।

যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইবার পর দেখা গেল যে, দক্ষিণের সৈন্যদের শক্তি ও শিক্ষার তুলনায় উত্তরের সেনাদল অত্যন্ত

দুর্ব্বল। প্রায় প্রত্যেক জায়গায় উত্তরের সেনাদল পরাজিত হইতে লাগিল।

দক্ষিণ-অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই অবসর-সময়ে যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়াছিলেন এবং সেখানকার ধনী পরিবারের ছেলেদের একমাত্র শিক্ষাই ছিল, সামরিক বিদ্যালয়ে। তা ছাড়া যুদ্ধ আরম্ভ হইবার আগে, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অধীন যে সব শিক্ষিত সেনানায়ক ছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই বাড়ী ছিল, দক্ষিণ-অঞ্চলে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহারা উত্তর-অঞ্চল ত্যাগ করিয়া দক্ষিণের সেনাদলে যোগদান করিল। সেই কারণে যুদ্ধের প্রারম্ভে লিন্‌কন্ দেখিলেন যে, প্রত্যেক জায়গায় অর্দ্ধ-শিক্ষিত সেনা-নায়কের অধীনে উত্তর-বাহিনী পরাজিত হইয়া আসিতেছে।

যুদ্ধক্ষেত্রের পরাজয়ের অপেক্ষা বিপদ বেশী হইল সাধারণ নাগরিকদের লইয়া। তাহারা সকল দোষ লিন্‌কনের ঘাড়ে চাপাইয়া তাঁহাকে নিন্দা করিতে লাগিল। দেখিতে-দেখিতে উত্তর-অঞ্চলের অধিকাংশ সংবাদ-পত্রও লিন্‌কনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিতে লাগিলেন। যে-সমস্ত লোক লইয়া তাঁহার মন্ত্রি-মণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল, তাহারাও একে-একে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। চারিদিক হইতে নিন্দা আর অভিযোগ লিন্‌কন্‌কে ঘিরিয়া ফেলিল।

কিন্তু অসীম ধৈর্য্যের সহিত তিনি সেই সব নিন্দা-গ্লানি সহ্য করিয়া দিনের পর দিন একা, এই সুনিশ্চিত পরাজয়কে কি করিয়া জয়ে পরিণত করা যায়, তাহার পরিকল্পনা করিতে লাগিলেন।

দেখিতে-দেখিতে দুই বৎসর চলিয়া গেল। অসংখ্য লোকক্ষয়ে উত্তরের লোকেরা বিচলিত হইয়া উঠিল। এই সময় তাহাদের আরো বিচলিত করিয়া তুলিল, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মনোভাব।

এই দুই শক্তিশালী রাষ্ট্র দক্ষিণ-সেনাবাহিনীকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাহার সংবাদ যখন উত্তর-অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহারা লিন্‌কনের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। এমন কি, যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতিরা তাঁহার পরামর্শ অগ্রাহ্য করিতে লাগিল।

এই নিদারুণ অসহায় অবস্থার মধ্যে যে কোন লোক ভাঙ্গিয়া পড়িত; কিন্তু লিন্‌কন্ একদিনের জন্যও বিচলিত হইলেন না। ধীরে-ধীরে তিনি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, তাঁহার সেনা-গঠনে কোথায় ত্রুটী রহিয়াছে, ধীরে-ধীরে তাহা তিনি সংশোধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সব চেয়ে বিপদ ছিল, তাঁহার পক্ষে সত্যকারের কর্ম্মী কোন সেনাপতি ছিলেন না। সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে তিনি

সাধারণ সৈনিকদের মধ্য হইতে সেই কর্ম্মীকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

যুদ্ধ যখন তৃতীয় বর্ষে চলিতেছে তখন তিনি সেই লোকের সন্ধান পাইলেন,---গ্রাণ্ট, শেরম্যান এবং ফ্যারাগাট্। ফ্যারাগাট্‌কে তিনি নৌ-সেনার ভার দিলেন এবং গ্রাণ্ট এবং শেরম্যানকে তিনি স্থলবাহিনীর নায়ক করিলেন। এই তিন জন লোকই তাহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, তাঁহারই প্ল্যান অনুযায়ী অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং তাহাদের নূতন উৎসাহের প্রেরণায় পরাজিত-প্রায় সৈন্যদল আবার নতুন উৎসাহে জাগিয়া উঠিল। লিন্‌কন্ নিজে এক শিবির হইতে আর-এক শিবিরে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দূর হইতে যাহারা নূতন প্রেসিডেণ্টের শুধু নিন্দাই শুনিয়াছিল, তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া তাহারা সকলে দেবতা বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল।

পরাজয়ের স্রোত পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। একটী-একটী করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গ্রাণ্ট এবং শেরম্যান্ ক্রমশ দক্ষিণ-বাহিনীদের হটাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। যাহাতে বাহিরের কোন সাহায্য দক্ষিণ না পায়, তাহার জন্য লিন্‌কনের প্ল্যান অনুযায়ী ফ্যারাগাট্ দক্ষিণ-উপকূলের বন্দর একে-একে দখল করিয়া লইতে লাগিলেন।

এই সময় লিন্‌কন্ আর-এক পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিলেন। যে ক্রীতদাস-প্রথা লইয়া এই যুদ্ধের সূচনা, তিনি স্থির করিলেন, তাহাদের মুক্তি দিবেন। প্রথমত, ক্রীতদাসদের মুক্তি দেওয়াই তাঁহার চরম আদর্শ; দ্বিতীয়ত, এই সময় যদি ক্রীতদাসদের মুক্তি-ঘোষণা করা হয়, তাহা হইলে দক্ষিণ-অঞ্চলে ক্রীতদাসদের নিকট হইতে আর কোন সাহায্য তাহারা পাইবে না। তাহার পরিবর্ত্তে কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ ক্রীতদাসরা উত্তর-বাহিনীতে আসিয়া যোগদান করিতে পারে।

মন্ত্রি-মণ্ডলীর কেহই তাঁহাকে আর প্রতিবাদ করিতে পারিল না; কারণ, ইতিমধ্যে তাঁহারা প্রত্যেকেই বুঝিয়াছিলেন যে, এই দীর্ঘকায় লোকটীর দেহের অন্তরে যে অন্তর আছে, তাহার তুলনা সমগ্র আমেরিকায় নাই।

বৎসরের প্রথম দিনে যখন ক্রীতদাসদের এই মুক্তি-ঘোষণা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে করা হইল, সমগ্র ক্রীতদাস-সমাজে তখন আনন্দের প্লাবন বহিয়া গেল। আজ তাহারা স্বাধীন, জগতের প্রত্যেক মানুষের মত আজ তাহারা স্বাধীন। প্রত্যেক নিগ্রোর অন্তর হইতে সেদিন এই কথা উচ্ছ্বসিত হইয়া বাহির হইয়াছিল,

"May de Lawd bress and keep you,
Massa Presidum Linkum!"

এই ঘটনার ফলে আর একদিক দিয়া দক্ষিণের আশা-ভরসা নির্ম্মূল হইয়া গেল। এতদিন যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সাহায্যের দিকে তাহারা চাহিয়া ছিল, ক্রীতদাসদের এই মুক্তি-ঘোষণার ফলে সেই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে সকল সংবাদ-পত্র একবাক্যে লিন্‌কন্‌কে প্রশংসা করিতে লাগিল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দক্ষিণকে সাহায্য করিবার প্রস্তাব তুলিয়া লইল।

গেটিস্‌বার্গের রণক্ষেত্রে উত্তর-বাহিনী প্রথম দক্ষিণ-বাহিনীকে বিপুলভাবে উচ্ছেদ করিয়া জয়লাভ করিল। এই জয় উপলক্ষে লিন্‌কন্ স্বয়ং রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বিজয়ী সৈন্যদের আহ্বান করিয়া এক বক্তৃতা দেন। ইতিহাসে সেই বক্তৃতা অমর হইয়া আছে।

সেই বক্তৃতায় তিনি বলেন,—চার কুড়ি এবং সাত বছর আগে, আমাদের প্রপিতামহগণ তাঁহাদের সঙ্গে এক নবীন জাতিকে সঙ্গে লইয়া এই দেশে শুভাগমন করেন। সেই নবীন জাতির জন্মদিনে তাঁহারা স্বাধীনতার নামে সেই জাতির জন্ম-পত্র স্বাক্ষর করেন—সেই জাতক-পত্র তাঁহাদের নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে আমরা পাইয়াছি, সেই আমাদের সুমহান্ সৌভাগ্য। কারণ, তাহাতে এই নবীন জাতির সকলের সম্মতিক্রমে এই শাশ্বত সত্যবাণীকে স্বীকার করা হয় যে,

এই পৃথিবীতে মানব মাত্রেই স্বাধীন, এই পৃথিবীতে মানুষে-মানুষে অধিকার-গত কোন পার্থক্য নাই।

আজ আমরা যে সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করিতে চলিয়াছি, আমাদের দিক দিয়া তাহা এক মহত্তম সংগ্রাম। কারণ, সেই মহাবাণীকে রক্ষা করিবার জন্যই আমাদের এই জীবন-মরণ প্রয়াস। আজ আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, সেই মহা-সংগ্রামে যাঁহারা জীবন দিয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতি-বাসরে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য।

এই ভূমি তাঁহাদের মৃত্যুতে সুপবিত্র, ভূতলে স্বর্গ-খণ্ড... তাঁহারা যে পুণ্য অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, যে মহিমা-কাহিনী অনাগত মানবদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের কোন শ্রদ্ধা-বাণীতেই আমরা যোগ্যভাবে বর্ণনা করিতে পারি না। এমন কোন পূজার মন্ত্র নাই, যাহার দ্বারা তাঁহাদের পূজা সম্পূর্ণ হইতে পারে। একমাত্র একটি উপায়ে তাঁহাদের সার্থক পূজা আমরা করিতে পারি...আমরা যারা জীবিত আছি, আমরা যদি তাঁহাদের এই অসম্পূর্ণ ব্রতকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারি, যদি আমাদের সাধনা একদা জগতে সেই মহা-আকাঙ্ক্ষিত দিনকে আনিয়া দিতে পারে, যেদিন জগতে এক নূতন শাসন-তন্ত্র জাগিয়া উঠিবে, যাহার মূল-মন্ত্র হইবে, "the Government of the people, by the people, for the people."

শেষের তিনটী কথা লিন্‌কন্ গেটিস্‌বার্গের সেই নিহত সৈনিকদের সমাধি-ক্ষেত্রে প্রথম উচ্চারণ করেন এবং তাহার পর হইতে সারা জগতে আদর্শ গণতন্ত্রের সংজ্ঞারূপে এই তিনটী কথা প্রবাদ-বাক্যের মত জগতের সকল জাতির লোক উচ্চারণ করিয়া আসিতেছেন।

গেটিসবার্গের জয়লাভের পর হইতে উত্তর-বাহিনী একে-একে প্রত্যেক যুদ্ধক্ষেত্রেই জয়লাভ করিতে লাগিল। লিন্‌কনের সম্বন্ধে চার বৎসর আগে লোকের যে বিতৃষ্ণা ছিল, আজ সহসা তাহা পূজাঞ্জলিতে পরিণত হইল...প্রত্যেক চার বৎসর অন্তর প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন...লিন্‌কন্ বিনা বাধায় দ্বিতীয় বার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইলেন...

সমগ্র যুক্ত-রাষ্ট্রের মধ্যে এখন সকলের দৃষ্টি তাঁহার উপর গিয়া পড়িল...তখন লোকে জানিল যে, এই যুদ্ধের চার বৎসর ধরিয়া এই একটী লোক কি অসীম ধৈর্য্য লইয়া কি অসাধ্যসাধন করিয়াছেন!

যুদ্ধক্ষেত্রে প্রায়ই তিনি সশরীরে পরিদর্শন করিতে বাহির হইতেন। কি ভাবে তিনি প্রত্যেক সৈন্যদের সহিত ব্যবহার করিতেন, কি করিয়া তাঁহার বিরাট আদর্শে প্রত্যেককে অনুপ্রাণিত করিতেন, তাহার নানা কাহিনীর মধ্যে একটি অপরূপ কাহিনী আছে।

উইলিয়াম্ স্কট নামে একটী তরুণ ছেলে উত্তর-বাহিনীতে সৈন্য হইয়া যোগদান করে। ক্রমান্বয়ে আটচল্লিশ ঘণ্টা মার্চ্চ করিয়া আসার পর, এক রুগ্‌ণ বন্ধুর পরিবর্ত্তে সে পাহারার কাজের ভার নেয়। পাহারা দিতে-দিতে, কখন তাহার অবসন্ন দেহ শিথিল হইয়া আসে, সে ঘুমাইয়া পড়ে, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। সেই ঘুমন্ত অবস্থায় তাহার ঊর্দ্ধতন অফিসার তাহাকে দেখিতে পাইয়া, সামরিক আইন অনুসারে তাহার মৃত্যুদণ্ড বহাল করেন।

যেদিন তাহাকে গুলি করিয়া মারা হইবে, তাহার আগের দিন শিবির পরিদর্শনে আসিয়া লিন্‌কন্ সেই ব্যাপার জানিতে পারিলেন। তিনি ব্যাপার শুনিয়া নিজে তৎক্ষণাৎ ছেলেটীর সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন।

তাহার বাপ, মা, বাড়ী-ঘর-দোরের সব কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করার পর, চলিয়া আসিবার সময় তিনি সেই তরুণ ছেলেটীর পিঠে হাত দিয়া বলিলেন, তুমি আমার ছেলের মতন, শোন...কাল তোমাকে মরতে হবে না...আমি আইনের চেয়ে মানুষকে বেশী শ্রদ্ধা করি...এবং তোমার কথা শুনে তোমাকেও আমি বিশ্বাস করি...তোমাকে আমি এখুনি তোমার দলে পাঠিয়ে দিচ্ছি—তুমি মুক্ত...কিন্তু আমার এই কাজের জন্যে আমাকে বিস্তর জবাবদিহি দিতে হবে এবং

শুধু তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমি আমার সমস্ত দরকারী কাজ ফেলে এত দূরের পথ এসেছি...এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, তুমি হয়ত বুঝেছ, উইলিয়াম স্কট, তুমি আমার কাছে ঋণী! আমি জানতে চাই, কি ভাবে সে ঋণ তুমি পরিশোধ করবে?

বিহ্বল উইলিয়াম স্কট কি বলিবে তাহা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। কৃতজ্ঞতা, আশা ও আনন্দে তাহার বাক্‌রোধ হইয়া আসিতেছিল। সে বুঝিতেও পারিল না, কোন্‌দিক হইতে প্রেসিডেন্ট সে কথা বলিলেন!

তাহার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া লিন্‌কন্ বলিয়া উঠিলেন, মনে রেখো স্কট, তোমার এই ঋণ তোমার হয়ে আর কেউ পরিশোধ করতে পারবে না। জগতে একটী মাত্র লোক আমার এই ঋণ পরিশোধ করতে পারে, সে লোকটি হলো স্বয়ং তুমি! আজকের দিন থেকে উইলিয়াম স্কট যদি তার কর্ত্তব্যে অবহেলা না করে, তাহলেই আমার ঋণ পরিশোধ করা হবে

উইলিয়াম স্কট সে কথা জীবনে ভোলে নাই, এবং অক্ষরে-অক্ষরে সে প্রেসিডেন্ট লিন্‌কনের সে ঋণ পরিশোধ করিয়া দিয়া গিয়াছিল। এই ঘটনার কিছুদিন পরে যুদ্ধক্ষেত্রে সে আহত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দেয়। জীবন-ত্যাগের মুখে সে

তাহার পার্শ্বচর সৈনিককে ডাকিয়া বলে,—ভাই, এই মৃত্যুপথ-যাত্রী বন্ধুর একটী অনুরোধ রাখিতে হইবে...যখন প্রেসিডেণ্ট লিন্‌কনের সঙ্গে দেখা হইবে তখন যেন তাঁহাকে বলো, উইলিয়াম স্কট তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিয়া গিয়াছে !

এইরূপ সুমহান্ ব্যক্তিগত স্পর্শের দ্বারা, সেই অখ্যাত কুলের একটী দরিদ্র ছেলে, একটা নবীন জাতিকে নব-চেতনায় উজ্জীবিত করিয়া তোলেন।

দীর্ঘ যুদ্ধের অবসানে, উত্তর জয়লাভ করিল...দক্ষিণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল...যে বিরাট আদর্শের জন্য লিন্‌কন্ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা জয়যুক্ত হইল...জগৎ হইতে হীন ক্রীতদাস-প্রথা উঠিয়া গেল...কিন্তু তাহার অপেক্ষা আর এক প্রিয়তর আদর্শ তখনও আহত অবস্থায় পড়িয়া ছিল... লিন্‌কনের জন্মভূমি...স্বদেশ...যে দেশ একদা জগতে মানবে-মানবে স্বাধীনতার মৈত্রী বন্ধনকে প্রতিষ্ঠিত করিবে, সে দেশ যদি দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় থাকিয়া যায়, তাহা হইলে সকল সাধনা ব্যর্থ হইয়া যায়।

উত্তরের বিজয়ী বীরেরা পরাজিত দক্ষিণকে যুদ্ধের শেষে যুদ্ধের রীতি অনুসারে শাস্তি দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। বহু প্রিয়জন তাহাদের আহুতি দিতে হইয়াছে ; বহু ক্ষতি, বহু লাঞ্ছনা, বহু বেদনা তাহাদের সহিতে হইয়াছে। সাধারণ

মানুষের মত আজ জয়ী হইয়া তাহারা তাহার প্রতিশোধ লইতে চায়।

লিন্‌কন্ বাধা দিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বিরাট আদর্শ লইয়া এই ক্রূর মনোভাবের বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়াইলেন। তিনি প্রতিশোধ-বাসনায়-মত্ত পার্শ্বচরদের ডাকিয়া বলিলেন, জয়ের মুহূর্ত্তে ক্রোধের দ্বারা জয়কে কলঙ্কিত হইতে দিবেন না। যুক্ত-রাষ্ট্র এক ও অবিচ্ছিন্ন। যে জিনিস এই বিচ্ছেদ ঘটাইতে-ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেই টুকুই আমাদের লাভ— ভগবানের দান। তাহা ছাড়া কেহ আমাদের শত্রু নাই। উত্তর দক্ষিণের শত্রু নয়, দক্ষিণ উত্তরের শত্রু নয়। এক যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে, আর-এক যুদ্ধ আজ আরম্ভ করিতে হইবে। ইহা হইল প্রীতির যুদ্ধ…যাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, প্রীতি দিয়া, ক্ষমা দিয়া, এক ভ্রাতৃবোধের দ্বারা আবার তাহা গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমার আয়ু থাকিতে উত্তরের কোন লোক দক্ষিণের কোন লোকের উপর সামান্যতমও প্রতিহিংসার বাসনা রাখিতে পারিবে না…যুক্ত-রাষ্ট্র এক ও অবিচ্ছিন্ন!

এই মহান্ মনোভাবের দ্বারা লিন্‌কন্ সেদিন প্রকৃতপক্ষে যুক্ত-রাষ্ট্রের নবজন্ম দান করিলেন। সেদিন জয়ের উন্মাদনায় যে মহাক্ষতি হইত, এই বিরাট উদার পুরুষ নিজের উদার

আদর্শে সেই ক্ষতি হইতে, সেই অপঘাত হইতে, তাঁহার দেশকে, মানব-সভ্যতাকে রক্ষা করিলেন।

নিজের মন্ত্রিসভায় প্রত্যেককে এই বিরাট আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া কর্ম্মক্লান্ত বীর একদিন সন্ধ্যায়, বহুদিন পরে, তাঁহার স্ত্রী এবং দুইজন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া থিয়েটার দেখিতে গেলেন।

বিরাট কর্ম্মের মধ্যে সেইটুকু শুধু অবসর-বিনোদন। থিয়েটার হইতেছে, এমন সময় হঠাৎ তাঁহারা যে বক্সে বসিয়াছিলেন, তাহার পিছন হইতে, একজন লোক উন্মাদের মত বাহির হইয়া, সোজা তাঁহার বক্ষ লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িল...লক্ষ্য ব্যর্থ হইল না...লিন্‌কনের রক্তাক্ত দেহ সেইখানেই লুটাইয়া পড়িল...

উন্মাদ আততায়ী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, দক্ষিণের পরাজয়ের প্রতিশোধ লইয়াছি!

কি হইল, তাহা জানিবার পূর্ব্বে আততায়ী অদৃশ্য হইয়া গেল!

কর্ম্ম-অন্তে ক্ষণিক অবসরই কর্ম্মবীর লিন্‌কনের চির-অবসর হইল!

উন্মাদ আততায়ী ভাবিয়াছিল, লিন্‌কন্‌কে সে হত্যা করিল···কিন্তু লিন্‌কন্ তখন মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপুরুষ···মানবতার মহা-যজ্ঞে নবতর দধীচি !